ফুটলো গোলাপ ইরান দেশে

নূর মোহাম্মদ মল্লিক

ফুটলো গোলাপ ইরান দেশে

নূর মোহাম্মদ মল্লিক

আরজু পাবলিকেশন্স
৬০/ডি পুরানা পল্টন
ঢাকা-১০০০

পরিবেশনায়

ঢাকা বুক কর্ণার	খন্দকার প্রকাশনী
৬০/ডি পুরানা পল্টন	৫০, বাংলাবাজার
ঢাকা-১০০০,	ঢাকা-১১০০
মোবাঃ ০১৭১১০৩০৭১৬	মোবাঃ ০১৭১১৯৬৬২২৯

www.icsbook.info

ফুটলো গোলাপ ইরান দেশে

নূর মোহাম্মদ মল্লিক

প্রকাশক
মাওলানা আমীনুল ইসলাম

শো-রুম
ঢাকা বুক কর্ণার ও এ, এ, অডিও ভিশন
৬০/ডি পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : মে ২০০০ ইং
তৃতীয় প্রকাশ : ফেব্রুঃ ২০০৯ ইং
কম্পোজ : প্রফেসর'স কম্পিউটার

মুদ্রণে
আলা আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৬০.০০ টাকা মাত্র

Futlo Golap Iran Deshe by Noor Mohammad Mollik,
Published by Maulana Aminul Islam
60/D Purana Palton Dhaka-1000
Price : Tk. 60.00 only

www.icsbook.info

প্রকাশকের কথা

শিশু কিশোরদের চরিত্র গঠনের জন্য মনীষীদের জীবনী আলোচনার প্রয়োজন। বাংলা ভাষায় চরিত্র গঠনের উপযোগী শিশু সাহিত্য খুবই কম। আমরা "আরজু পাবলিকেশন্স" থেকে শিশু সাহিত্য প্রকাশ করার এ গরুত্বপূর্ণ কাজ করার চেষ্টা করছি। এজন্যেই "ফুটলো গোলাপ ইরান দেশে" গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়েছে। এই প্রন্থটি প্রকাশের জন্য এর লেখক নূর মোহম্মদ মল্লিককে ধন্যবাদ। তিনি আমাদের অনুরোধে সারা দিয়ে শিশু কিশোরদের উপযোগী করে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। এই গ্রন্থ প্রকাশের সাথে যারা জড়িত আছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এই বইটিতে যদি কোন ভুলত্রুটি থেকে থাকে তবে তা' আমাদের দৃষ্টিগোচর করার আবেদন জানাচ্ছি। আমরা পরবর্তী সংস্করণে বইটি আরো নির্ভুল ও আরো সুন্দরভাবে প্রকাশের চেষ্টা করবো। আমাদের প্রকাশনীর প্রথম প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে সকলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে এই বইটি দেখবেন বলে আমি আশা করছি।

মাওলানা আমিনুল ইসলাম
ঢাকা বুক কর্ণার

www.icsbook.info

লেখকের কথা

আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে "ফুটলো গোলাপ ইরানদেশে" প্রকাশিত হল। আমাদের শিশু কিশোরদের দেশের যোগ্য নাগরিক রূপে গড়ে তোলার জন্য চরিত্র গঠনের অন্য কোন বিকল্প নেই। আর এজন্যে দরকার ভাল লোকদের জীবনী সম্পর্কে অবহিত হওয়ার। ছোটদের জন্য সহজ সরল ভাষায় কোন কিছু রচনা করা খুবই কঠিন কাজ। আমি এই কঠিন কাজে হাত দিয়ে ইরানের কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত কবি, বিজ্ঞানী, চিকিৎসাবিদ ও পন্ডিত ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এ ব্যাপারে যতটা যত্নের সাথে কাজ করা দরকার ছিল তা' করতে পারিনি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণ সে ব্যাপারে খেয়াল রাখবো। এসব মনীষীর জীবন ও কর্মসম্পর্কে অবহিত হয়ে শিশু ও কিশোররা যদি মহৎ জীবন গঠনে আগ্রহী হয় তবেই আমার শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

নূর মোহাম্মদ মল্লিক
৫৬, সিদ্ধেশ্বরী লেন, ঢাকা

www.icsbook.info

সূচীপত্র

* ইরান পরিচিতি ৭
* শেখ সা'দী ১১
* মহাকবি ফেরদৌসী ১৭
* ইবনে সিনা ২৩
* ওমর খৈয়াম ২৯
* মাওলানা জালালউদ্দিন রুমী ৩৩
* ইমাম গাজ্জালী ৩৬
* মহাকবি হাফিজ ৪৩
* আল বেরুনী ৪৮
* ইমাম খোমেনী ৫৪
* আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ আলী খামেনেয়ী ৬২
* মহাকবি নিজামী ৬৪
* মোহম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল রাযী ৭০
* আবদুর রহমান জামী ৭৫

www.icsbook.info

-ঃ উৎসর্গ ঃ-

সাংবাদিকতায় আমার মহান শিক্ষক

জনাব সুলতান আহমদের করকমলে

বিনয়াবনত,

নূর মোহাম্মদ মল্লিক

www.icsbook.info

ইরান পরিচিতি

নাম ঃ ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান।

আয়তন ঃ ১,৬৪৮৩০০০ কি. মি. জনসংখ্যা ঃ ৬৫৬১২০০০ রাজধানী-তেহরান, জন্মহার হাজারে ৪৬.০ জন। মৃত্যুহার হাজারে ১২.০ জন। পুরুষের হার-৫১.১৩% , মহিলার হার-৪৮.৮৭%, গড় আয়ু পুরুষ-৬৫.০ বৎসর, মহিলা ৬৫.৫ বৎসর। রাষ্ট্রধর্ম-ইসলাম। রাষ্ট্রভাষা-ফারসী।

জাতিগত বিভক্তি ঃ পারসিয়ান ৪৫.৬%, মাজেরী ১৬৮ কুর্দী-৯.১%, বাখতিয়ারী ১.৭% নুরী ৪.৩%. সিলাকী-৫.৩%, মাজান গরানী ৩.৬%।

ধর্মীয় বিভক্তি ঃ মুসলিম ৯৮.৮%, খৃষ্টান ০.৭%, ইহুদী-০.৩, অন্যান্য-০.২%।

অর্থনীতি ঃ মুদ্রার নাম ঃ রিয়াল RIS. বাজেট-৫,৯৮৪.২৭ m$, আদমানী-১৬,২৫০ m$, ডলার। রফতানী. ১৩,৬০০ m$,

মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP) , ৯৩,৫০০ m$,মাথা পিছু আয়- ১,৯৫০ ডলার

শিক্ষা ব্যবস্থার স্কুল -৭০,০০০ টি, ছাত্র, ১ কোটি ২৭ লাখ--- উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান -১,২৩০টি, ছাত্র ৪২১, ৯৯১ জন, শিক্ষিতের হার-৫৪.২ ভাস,

অন্যান্য ঃ দৈনিক পত্রিক-২০টি, হাজারে পাঠক ১৪.৩ জন। রেডিও ৩.৩ জনে ১টি টেলিভিশন ২০ জনে ১টি, টেলিফোন-২০ জনে ১টি।

ডাক্তার-২৫০৬ জনে ১জন, হাসপাতাল শয্যা ৬৫০ জনে ১টি।

সামরিক বাহিনী ঃ মোট সদস্য-৫৪,৬০০০ জন। সেনা ঃ ৩১,২০০০, নৌ-১৪৫,৯০০, বিমান-৩৬,৮০০ বিপ্লবী গার্ড বাহিনী, ১৫৫,০০০ জন।

সাবমেরিন - টি, ডেষ্ট্রায়ার ৫টি, ফিগ্রেট ৬টি, জঙ্গী বিমান - ৮০০ টি, ট্যাংক ৫০০০ টি।

জঙ্গী বিমান -৮০ টি, ট্যাংক -৫০০ টি।

বাজেট- GNP এর ৭৯%

www.icsbook.info

সরকার পদ্ধতিঃ বহুদলীয় গনতন্ত্র। দুই কক্ষের সংসদ। (ক) প্রতিনিধি পরিষদ ২৭০ সদস্য, (খ)) সিনেট -৫০০ সদস্য।

অবস্থান ঃ দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার একটি পার্বত্য দেশ। ইরানের অধিকাংশ অঞ্চলই মালভূমি। পারস্য উপসাগর, কাস্পিয়ান সাগর এবং ওমান উপসাগরের তট রেখা দ্বারা ইরান বেষ্টিত। ইরানের মরুদ্যান এবং নিবিড় বনাঞ্চল থাকলেও বৃহৎ লবনাক্ত মরুভূমি আছে। ইহা ২৪টি প্রদেশ নিয়ে গঠিত।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ

১৯৪৬-বৃটিশ, মার্কিন এবং সোভিয়েত বাহিনীর ইরান ত্যাগ।

১৯৫১ প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোসাদ্দেক তৈল ক্ষেত্রগুলোতে জাতীয়করণ।

১৯৫৩ মোসাদ্দেককে অপসারণ করে শাহ দেশের সর্বময় ক্ষমতা হাতে নেন।

১৯৭৫ শাহদেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৭৮ শাহের বিরুধী শক্তি খোমেনীর নেতৃত্বে ফ্রান্সে ঐক্যবদ্ধ হন।

১৯৭৯ শাহ বিরোধী গণআন্দোলন। মার্কিনীদের উস্কানীতে শাহের বাহিনী হাজার হাজার ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করে। শাহের দেশ থেকে পলায়ন। আয়াতুল্লাহ খোমেনী দেশে প্রত্যাবর্তৃন করে দেশকে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা দেন। ইরানী ছাত্ররা মার্কিন দূতাবাস অবরোধ করে রাখে।

১৯৮০-ইরানের উপর ইরাকের সামরিক আগ্রাসন। উপসাগর যুদ্ধ শুরু।

১৯৮৪ -ইরান ইরাক যুদ্ধ বন্ধের ব্যাপারে মিশরীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।

১৯৮৫ উপসাগর যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করে। জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেলের শান্তি পূর্ণ প্রক্রিয়া ব্যর্থ।

১৯৮৮-মার্কিন মিসাইলের আঘাতে ইরানী যাত্রী বাহিনী বিমান ধ্বংস, ২৯০ জন ইরানী নিহত।

ইমাম খোমেনী ইরাকের সাথে যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণা দেন। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ইরান ও ইরাকের মধ্যে আলোচনা। ইরাক ও ইরানের মধ্যে প্রথম বারের মত বন্দী বিনিময়।

www.icsbook.info

১৯৮৯-খোমেনী রুশদীকে মৃত্যুদন্ড দেন। খোমেনীর ইন্তেকাল। আলী খোমেনী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নেতা মনোনীত। রাফসানজানী ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯৯০-ইরাকের সাথে স্থায়ী শান্তি চুক্তি প্রতিষ্ঠা।

১৯৯১-উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় প্রচুর সংখ্যক ইরাকী জঙ্গী বিমানকে আশ্রয় দেন। লক্ষ লক্ষ ইরাকী শিয়ার ইরাকী বাহিনীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার্থে ইরানে প্রবেশ। ৭ম শতব্দীদের ইরানে আরবদের আগমনের ফলে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করে। এই সময় ওমর খৈয়াম তার বিখ্যাত গ্রন্থ রুবাইয়া রচনা করেন। ১২৫০ (খৃঃ) মোগলগন এর ১৩৭০ (খ্রঃ) তৈমুর লংগ ইরান আক্রমণ করেন। ১৫০২ সালে মোগলদের পতনের পর পারস্যে একজন শাহের অধীনে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরলোকগত শাহের পিতা রেজাখান ১৯২৫ (খ্রিঃ) ইরানের রাজতন্ত্র চালু করেন।

১৯৪১ সালে তিনি নিজেকে ইরানের সম্রাট ঘোষনা করেন এবং ময়ুর সিংহাসনের আরোহন করেন। রেজা খানের মৃত্যুর পর তার পুত্র মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহলভী সম্রাট হন। ১৯৫১ সালে মজলিসে তৈল শিল্প জাতীয়করন করে। অ্যাংলো ইরানিয়ান তৈল কোম্পানী বন্ধ করে দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক দল

(১) লাল হাত-আজাদী (লিবারেশন মুভমেন্ট অব ইরান) প্রতিষ্ঠা ১৯৬১ সাল। ক্ষমতাসীন। ইসলামিক মহাসচিব ডঃ মেহদী বাজারগান ।

(২) তুদেহপাটি-প্রতিষ্ঠা ১৯৪১ সাল। কমিউনিষ্ট মহাসচিব আলী কাভারী।

সংবাদ সংস্থা

(১) ইসলামিক রিপাবলিক নিউজ এজেন্সী (ইরান IRNA) প্রতিষ্ঠা ১৯৩৬ সাল। পরিচালক-হোসাইন নাসারী। ফোন (০০২) ৮৯২০৫০০

সংবাদপত্র

(১) তেহরান টাইমাস- ১৯৭৯ সাল। স্বাধীন ইংরেজী। প্রধান সম্পাদক এস,বি আনসারী, ফোন- (০০২১) ৮৩৯৯০০০।

www.icsbook.info

কায়হান-প্রতিষ্ঠা ১৯৪১ সাল। ফরাসী। প্রধান সম্পাদক- সাইয়েদ মুহাম্মদ আশগারী। ফোন (০২১) ৩১০২৫১

শিল্প ও সম্পদ ঃ তৈল উৎপাদনে ইরান পৃথিবীর চতুর্থ স্থানীয় এবং তৈল রপ্তানীতে পৃথিবীর ২য় স্থান অধিকারী। খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস তামা, লোহ, সীসা, দস্তা, কয়লা ও জিপসাম, উল্লেখযোগ্য। রাশিয়ার সাহায্যে ইরান ইস্পাহানে একটি স্টীল মিল স্থাপন করে। বিনিময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে গ্যাস লাইনের সাহায্যে গ্যাস সরবরাহ করা হয়। এখানে সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, চিনি কল এবং মোটর গাড়ীর সংযোজন কারখানা প্রভৃতি আছে।

কৃষিদ্রব্য ঃ ইরান কৃষি প্রধান দেশ। গম বার্লি, ধান, উল, তামাক, চিনি, কাঁচা সিল্ক, .তুলা, প্রধান উৎপন্ন ফসল। শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে বস্ত্র, গালিচা এবং কার্পেট বিখ্যাত।

প্রসিদ্ধ শহর ও বন্দরঃ সিরাজ নগরী প্রাচীন কালের ধ্বংসাবশেষের জন্য বিখ্যাত।

✪✪✪

www.icsbook.info

আল্লামা শেখ সাদী

ইরানের ফারেস প্রদেশে সিরাজ নগর অবস্থিত। সিরাজ নগরের তাউস এলাকায় সৈয়দ আব্দুল্লাহ্ নামে এক জ্ঞানী লোক বাস করেন। তিনি যেমনি জ্ঞানী তেমনি ভাল লোক ছিলেন। সৈয়দ সাহেব দীর্ঘদিন যাবত নিঃসন্তান। তিনি ও তার স্ত্রী ক্রমেই বৃদ্ধ হয়ে পড়ছেন। কিন্তু তাদের কোন সন্তান নেই। সৈয়দ সাহেব কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে সন্তান চেয়ে মুনাজাত করেন। শেষে একদিন সত্যি সত্যিই তাঁর স্ত্রী গর্ভবর্তী হলেন। ক্রমে দশ মাস দশ দিন পার হল।

ময়মুরা খাতুন প্রসব বেদনায় কাঁদছেন। হঠাৎ মায়ের বুক আলো করে ফুটফুটে এক শিশুর জন্ম হল। শিশুর চাঁদ মুখ দেখে মা তার সব কষ্ট ভুলে গেলেন। পিতা নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। সাতদিন কেটে গেল। সৈয়দ সাহেব সন্তানের আকীকা দিয়ে নাম রাখলেন সরফুদ্দিন। সৈয়দ সাহেবের পিতার নাম ছিল সরফুদ্দিন। সেই নামে নাম রাখা হল।

সিরাজের শাসনকর্তা তোকলাহ্ বিন জঙ্গী বৃদ্ধ সৈয়দ সাহেবের পুত্র সন্তান লাভের ঘটনায় খুবই অবাক হন। সৈয়দ সাহেব শিশু পুত্রকে নিয়ে তাঁর দরবারে গেলেন। সরফুদ্দিনের হাসিমাখা মুখ আর মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনে দরবারের সবাই মুগ্ধ। তোকলাহ্ বিন জঙ্গী খুশী হয়ে সরফুদ্দিনের পিতাকে একশ' স্বর্ণমুদ্রা উপহার দিলেন।

মায়ের কাছে সরফুদ্দিন লেখাপড়া শুরু করেন। তিনি ৭ বছর বয়সেই কোরআন শরীফ পড়া শেষ করলেন। পিতা সরফুদ্দিনকে সিরাজ নগরের বিখ্যাত আলেম ও আল্লাহর ওলী হযরত শেখ মোসলেহুদ্দীনের কাছে নিয়ে এলেন। শেখ মোসলেহুদ্দিন

www.icsbook.info

সরফুদ্দীনের চেহারা ও লক্ষণ দেখে বুঝলেন, ভবিষ্যতে এ ছেলে বিখ্যাত লোক হবে। তিনি ছেলের পিতাকে সে কথা জানালেন। তিনি তার জন্য দোওয়া করলেন এবং সরফুদ্দিনের আরেক নাম দিলেন শেখ মোসলেহুদ্দিন।

সরফুদ্দিন শেখ মোসলেহুদ্দীনের কাছে ৩ বছর থাকলেন। এ সময় তিনি কোরআন শরীফ মুখস্থ করলেন। হঠাৎ শেখ মোসলেহুদ্দীন ইন্তেকাল করলেন। বালক সরফুদ্দিন তার শিক্ষক শেখ মোসলেহুদ্দীনের জন্য অনেক কাঁদলেন।

রাজ পরিবারের ছেলেদের সাথে সরফুদ্দিনের খুব দোস্তি হয়ে গেল। তিনি তাদের সাথে যুদ্ধবিদ্যা শিখলেন। তরবারি চালনা ও অশ্ব চালনাও শিখলেন। সিরাজের নামকরা বিদ্যালয়ে সে সময় গন্ডগোল চলছিল। কাজেই সৈয়দ সাহেব নিজেই পুত্রকে লেখাপড়া শেখাতে লাগলেন।

সৈয়দ সাহেব স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে হজ্বে গেলেন। সরফুদ্দিন পিতা-মাতার সাথে দুর্গম পার্বত্য পথ পাড়ি দিয়ে মক্কায় হজ্ব পালন করেন এবং পরে মদীনায় গিয়ে মহানবীর মাজার জিয়ারত করেন। পরে তারা নিরাপদে দেশে ফেরেন।

কিছুদিন পর সৈয়দ সাহেব ইন্তেকাল করেন। এর ফলে সরফুদ্দিন এতিম ও অসহায় হয়ে পড়েন। পিতা সরকারী চাকুরী করতেন। যা কিছু পেতেন তা' দিয়ে কষ্ট করে জীবন যাপন করতেন। হঠাৎ পিতার মৃত্যুতে তাদের আয় বন্ধ হয়ে গেল। সংসারে অভাব অনটন নেমে এল।

এ সময় তিনি সিরাজ নগরের আজদিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। কিন্তু রাজ্যের সর্বত্র তখন রাজনৈতিক বিশৃঙখলা ও অশান্তি চলছে। এরকম অবস্থায় তিনি বেশীদিন ঐ মাদ্রাসায় পড়ালেখা করতে পারলেন না। তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের আশায় বাগদাদে চলে যান। বাগদাদে এসে তিনি অনাহারে আর অর্ধাহার দিন

www.icsbook.info

কাটাতে লাগলেন। হঠাৎ ভাগ্যক্রমে তাঁর পিতার এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি সরফুদ্দিনকে স্থানীয় এক মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। এখানে পড়ালেখা শেষ করে বাগদাদের বিখ্যাত নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে তিনি বিখ্যাত আলেম আল্লামা আবুল ফাতাহ ইবনে জওজী (রঃ) এর কাছে তাফসীর, হাদিস ও ফিকাহ শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। মাত্র অল্পদিনেই তিনি মাদ্রাসার সেরা ছাত্র বিবেচিত হন এবং মাসিক বৃত্তি লাভ করেন। মাত্র ৩০ বছর বয়সে তিনি তাফসীর, হাদিস, ফিকাহ্, সাহিত্য দর্শন খোদাতত্ত্ব ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ পান্ডিত্য অর্জন করেন।

তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভে সন্তুষ্ঠ ছিলেন না। বরং আল্লাহর ভালবাসায় নিজেকে পাগল পারা করতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এসময় তিনি সে যুগের অন্যতম ওলী শেখ সাহাবুদ্দিন সোহরাওয়ার্দীর মুরিদ হন। তাঁর সাথে থেকে সরফুদ্দিনের অন্তরাত্ম হেরার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তার মন থেকে জগতের যাবতীয় অন্ধকার দূর হয়ে গেল।

৩০ বছর বয়সে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শেষ করে সরফুদ্দিন বিদেশ ভ্রমন শুরু করেন। তিনি এক জন সাধক দরবেশের মত খালি হাতে পায়ে হেঁটে বহুদেশ সফর করেন। এ সময় নিজেও যেমন জ্ঞান অর্জন করতেন তেমনি মানুষকেও জ্ঞানের পথে আহবান করতেন। তিনি সমগ্র ইরান, এশিয়া মাইনর, আরব ভূমি, সিরিয়া, মিসর, জেরুজালেম, আর্মেনিয়া, আবিসিনিয়া, তুর্কিস্তান, ফিলিপাইন, ইরাক, কাশগড়, হাবস, ইয়ামন, শাম, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, ভারতের সোমনাথ ও দিল্লীসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পায়ে হেঁটে ভ্রমন করেন। এসব ভ্রমন করতে গিয়ে তিনি পাড়ি দেন পারস্য উপসাগর, ওমান সাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর। এই সফরের ফলে তিনি বিশ্বের ১৮টি ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি পায়ে হেঁটে ১৪ বার হজ্ব করেন।

www.icsbook.info

দেশ ভ্রমনকালে জালেম ও বর্বরদের হাতে সরফুদ্দিনকে বহুবার কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। একবার ফিলিস্তিনের এক জঙ্গলে আশ্রয় নিয়ে আল্লাহর বন্দেগী করছিলেন। এমন সময় খৃষ্টানরা তাকে আটক করে ইহুদী কৃতদাসদের সাথে মাটি কাটার কাজে নিয়োজিত করায়। সে সময় তাঁর দুরাবস্থার সীমা ছিল না। তিনি খুবই দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। একদিন আলিপ্পো শহরের এক বনিক সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি সরফুদ্দিনকে আগে থেকে চিনতেন। সরফুদ্দিনকে মাটি কাটতে দেখে খোঁজ খবর নিলেন। প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরে ১০ দিনার মুল্যে তাকে ক্রয় করে আজাদ করে দিলেন। তাকে সাথে করে আলিপ্পো শহরে তার বাড়ীতে আনেন। বনিকের এক বদ্‌মেজাজী ও বয়স্কা কন্যা ছিল। তার সাথে তিনি ১০০ দিনার মোহরানায় সরফুদ্দিনের বিয়ে দিলেন। মোহরের অর্থ বনিক নিজেই পরিশোধ করেন। সরফুদ্দিন বিপদে ধৈর্য্য হারাতেন না। বিয়ের পর স্ত্রীর বদ্‌মেজাজের কারণে তার সংসার সুখের হয়নি। স্ত্রী একদিন বিদ্রুপ করে বললেন, আচ্ছা তুমি কি সেই হতভাগা নও–যাকে আমার পিতা দয়া করে ১০ দিনার মূল্যে কিনে নিজের হাতে মুক্তি দিয়েছেন? সরফুদ্দিন বললেন, হ্যাঁ সুন্দরী, আমি সেই হতভাগা যাকে তোমার পিতা ১০ দিনার দিয়ে কিনে মুক্ত করে আবার ১০০ দিনার দিয়ে তোমার দাসত্বে নিযুক্ত করেছেন। পরবর্তীকালে সরফুদ্দিনের এই বিয়ে টেকেনি।

সরফুদ্দিন বহু কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর এসব কাব্যে রয়েছে মানুষের নৈতিক চরিত্র সুন্দর করার অমূল্য বানী। আজও তার কাব্য গ্রন্থ–বিশেষ করে কারিমা, গুলিস্তা ও বোস্তা বিভিন্ন মাদ্রাসায় পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। আলেমগণ ওয়াজ নসিহত কালে তার কবিতা আবৃত্তি করে থাকেন। শিশুরা তার কারিমা গ্রন্থের কবিতা আজও পাঠ করে।

www.icsbook.info

"কারিমা ব-বখশায়ে বর হালে মা
কে হাস্তম আমীরে কামান্দে হাওয়া।

বাংলা অনুবাদ ঃ "হে দয়াময় প্রভু! আমার প্রতি রহম কর। আমি কামনা বাসনার শিবিরে বন্দী। তুমি ছাড়া আর কেউ নেই যার কাছে আমি দোওয়া করবো। তুমি ছাড়া আর কেউ মাফকারী নেই। তুমি আমাকে গোনাহ থেকে রক্ষা কর। আমার গোনাহ মাফ করে নেকীর পথ প্রদর্শন কর।

সরফুদ্দিনের গুলিস্তা ও বোস্তা বিশ্ব সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। এটি ল্যাটিন, ফরাসী, ইংরেজী, জার্মানি, আরবী, ওলন্দাজ, উর্দু, তুর্কী, বাংলা প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। এছাড়া তাঁর আরও বহু গ্রন্থ রয়েছে। যেমন–নসিহত-অল-মলুক, রিসালায়ে আশ কিয়ানো, কিতাবে মিরাসী, মোজালেসে খামসা, তরজিয়াত, রিসালায়ে সাহেবে দিউয়ান, কাসায়েদল আরবী, আৎতবিয়ত ইত্যাদি।

সরফুদ্দিন ছিলেন সদাই হাসিখুশী। লোকজন তার কাছে গেলে তাদের মন আনন্দে ভরে উঠতো। এজন্যে তার এক নাম সা'দী। শেখ শব্দটি জ্ঞানী ব্যক্তিদের নামের আগে বলা হয়। এজন্যে লোকজন তার আসল নাম ভুলে গিয়ে শেখ সা'দী নামেই তাকে চিনতো। তাঁর জন্ম ১১৭৫ সালে। তিনি ১২০ বছর বেঁচেছিলেন। এছাড়া তিনি ফারেসের শাসনকর্তা অতাবেক সাদ বিন জঙ্গীর রাজত্বকালে যখন কবিতা লিখতেন তখন নিজের নামের সাথে সাদী লিখতেন। এভাবে তাঁর সাদী নামটিই পরিচিত হয়ে যায়।

শেখ সাদীর জীবনকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

www.icsbook.info

প্রথম ৩০ বছর শিক্ষা লাভ, দ্বিতীয় ৩০ বছর দেশ ভ্রমন, তৃতীয় ৩০ বছর গ্রন্থ রচনা ও চতুর্থ ৩০ বছর আধ্যাত্মিক চিন্তা ও সাধনা।

শেষ বয়সে শেখ সাদী (রঃ) মাতৃভূমি সিরাজে ফিরে আসেন। তিনি এক নির্জন স্থানে এবাদত বন্দেগি করে জীবন কাটান। এখানে তিনি মোরাকাবা ও মোশাহাদা করতেন। মাঝে মাঝে কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে তার সাথে দেখা করতেন। প্রতিদিন বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন পেশার লোক তাঁর কাছে এসে তাঁর জ্ঞান গর্ভ উপদেশ শুনতেন। তিনি দৈনিক ৪/৫ ঘন্টা কোরআন তেলাওয়াত করতেন। বার্ধক্যেও তিনি যুবকের মত শক্তিশালী ছিলেন। অবশেষে ১২/২৮ খৃষ্টাব্দে ১২০ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। সিরাজ নগরের 'দিলকুশা' নামক স্থানের এক মাইল পূর্ববর্তী পাহাড়ের নীচে তাঁর মাজার রয়েছে। মাজার জেয়ারত কারীদের পাঠের জন্য শেখ সাদীর নিজ হাতে লেখা একটি কাব্যগ্রন্থ মাজারে রক্ষিত আছে। এ স্থানটি সাদীয়া নামে পরিচিত।

✪✪✪

মহাকবি ফেরদৌসী

তাঁর নাম মোহাম্মদ আবুল কাশেম। তিনি ইরানের তুস নগরের 'বাঝ' গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তুস নগরে এক সুন্দর বাগান ছিল। সেখানে কত রকমের গোলাপ ফুটতো তার কোন লেখা জোখা নেই। বাগানটি ছিল আবার সেদেশের রাজার। এই বাগানের দেখাশুনা করতেন মোহাম্মদ ইসহাক ইবনে শরফ শাহ। তাঁরই পুত্র ছিলেন আবুল কাশেম। ছোট বেলায় আবুল কাশেম পিতার সাথে বাগানে ঘুরে বেড়াতেন। সুন্দর সুন্দর ফুল দেখতে যেমন ভাল লাগে আবার সেগুলোর কি মনোমুগ্ধকর সুগন্ধী। তিনি প্রাণভরে ফুলের সুবাস নিতেন। গোলাপের বাগানে বেড়াতে বেরিয়ে আবুল কাশেম মুগ্ধ হয়ে যেতেন। উপরে চারপাশে নীল আকাশ। সবুজ গাছপালা। আর তার মাঝে ফুটে আছে ছোট বড় হরেক রকম গোলাপ।

বাল্যকাল তিনি পিতার কাছে পড়ালেখা করেন। পরে তিনি স্থানীয় একজন পন্ডিতের কাছে জ্ঞান অর্জন করেন। পিতা রাজার বাগানের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। তাই তার কোন অভাব ছিল না রাজার কাছ থেকে তিনি 'তনখা' হিসেবে যা কিছু পেতেন তাতে ভালভাবেই তার সংসার চলে যেত।

ছোট বেলায় বাগানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তার মনে কবিতা লেখার কথা মনে আসে। বাগানের পাশ দিয়ে বয়ে যায় একটা ছোট নদী। কোথা থেকে এত পানি আসে আবার কোথায় চলে যায়। এগুলো তার মনে রেখাপাত করে। নদীর ধারে কত পাথর পড়ে আছে। তিনি তারই একটার উপর বসেন আর প্রাকৃতিক এসব সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন। এখানে বসে আবুল কাশেম কবিতা লেখেন।

www.icsbook.info

পিতার অবস্থা ভাল ছিল। তিনি ইন্তেকালের সময় অনেক জমি জায়গা রেখে যান। কাজেই আবুল কাশেমের জীবন কাটানোর মত প্রয়োজনীয় অর্থের কোন অভাব ছিল না। তিনি প্রতিবছর এসব জায়গা জমি থেকে প্রচুর আয় করতেন। কিন্তু ধন সম্পদের দিকে তার কোন নজর ছিল না। কোন রকমে খেয়ে পরে চলাটাই ছিল তার লক্ষ্য। তাঁর সাধনা ছিল ভাল ভাল কবিতা রচনার মাধ্যমে মানুষকে ভাল এবং কল্যাণের দিকে উদ্বুদ্ধ করা। সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করাই ছিল তার জীবনের মিশন।

পিতা-মাতা শখ করে অল্প বয়সেই তার বিয়ে দেন। তার ঘরে মাত্র এক মেয়ে। মেয়েটিকে তিনি নিজের কাছে রেখে লেখাপড়া শেখান। সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্টে তিনি খুব বিচলিত বোধ করতেন। তাদের সাথে আলাপ করে তাদের দুঃখ কষ্টের উপশম করতে চাইতেন। এসব খবর সে দেশের রাজার কানে গেল। তখনকার দিনে রাজার গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা এসব খবর রাখত। তারা কোন লোককে জনপ্রিয় হতে দেখলে রাজাকে জানিয়ে দিত। এর ফলে রাজা সেই লোককে সহ্য করতে পারতেন না। হয় তাকে সেদেশ ছেড়ে চলে যেতে হত নয়তো রাজার সাথে মোকাবেলা করে টিকে থাকতে হত। আবুল কাশেম কোন ঝক্কি ঝামেলা পছন্দ করতেন না। তিনি ভাবুক কবি। রাজা হওয়া তার লক্ষ্য নয়। বরং কবিতা লেখা আর দুঃখী মানুষের দুঃখ দূর করাই ছিল তার একমাত্র কাজ।

রাজার কাছে তার বিরুদ্ধে অনেক রকম মিথ্যা অভিযোগ আনা হল। ফলে রাজা তাকে গ্রেফতার করার পরিকল্পনা করেন। আবুল কাশেম সে খবর পেলেন। রাজ দরবারেও অনেক সভাসদ তাকে ভালবাসতেন। তারা সময় মত তাকে রাজার পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিলেন। কাজেই আবুল কাশেম মেয়েকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে।

www.icsbook.info

তিনি গজনীতে গেলেন। সেখানকার সুলতান খুব ভাল লোক। তার নাম মাহমুদ। দেশ বিদেশের জ্ঞানী গুণী লোকজনকে মাহমুদ খুব সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। জ্ঞানী ও পন্ডিত লোকেরাও মাহমুদের কথা শুনে তার কাছে ছুটে আসতেন। রাজদরবারে বসতো কবিতা আবৃত্তির আসর। আবুল কাশেম কবিতা রচনা করতেন। কাজেই তিনি ভাবলেন সুলতানের সাথে দেখা করতে পারলে তিনি যথাযথ কদর পাবেন। এজন্যেই তিনি গজনীতে আসেন কিন্তু সুলতানের সাথে দেখা করাতো আর চাট্টিখানি কথা নয়। মনে চাইলেই তো আর তার সাথে দেখা করা যায় না। এজন্য অনেক নিয়ম-কানুন রয়েছে। অনেক রকম কাঠ খড় পুড়াতে হয়।

সুলতানের দরবারে যারা কবি রয়েছেন। তারা সহজেই অন্য কবিকে তাদের মাঝে স্থান দিতে চান না। কাজেই রাজদরবারে প্রবেশের সুযোগ আর মেলে না। আবুল কাশেম সুলতানের দরবারে প্রবেশের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। কিন্তু সৎ লোকের সহায় থাকেন আল্লাহ। আল্লাহর ইচ্ছায় সুলতানের উজির মোহেক বাহাদুর তাঁর প্রতি সদয় হলেন। মোহেকেই আবুল কাশেমকে রাজদরবারে নিয়ে গেলেন।

সুলতানের সাথে আবুল কাশেমের প্রথম পরিচয় হল কবিতা পাঠের মাধ্যমে। সুলতান আবুল কাশেমের কবিতা শুনে মুগ্ধ হলেন। কবিতার ভাব, চিত্র কল্প, শব্দ চয়ন এত উচ্চস্তরের যে সুলতান বুঝলেন ইনি অনেক বড় মাপের কবি। তিনি যেন এ রকম একজন কবির জন্যই এতকাল অপেক্ষায় ছিলেন। তার বহুকালের প্রত্যাশা যেন আজ পূরণ হতে চলেছে। মাহমুদ মহাখুশী। তিনি নিজেও কবি ছিলেন। আবুল কাশেমের কবিতা শুনে তিনি তাকে 'ফেরদৌসি' উপাধি দিলেন। বেহেশ্‌তের মধ্যে সবচেয়ে সেরা হচ্ছে এই জান্নাতুল ফেরদৌস। এই কবিও

www.icsbook.info

সকল কবির সেরা। তাই তাকে যথার্থই ফেরদৌসি বলা যায়। সুলতান আবেগ ভরে আবুল কাশেমকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন। আয় ফেরদৌসি তু দরবার মে ফেরদৌস কারদী। এর মানে হল, হে ফেরদৌসি তুমি সত্যিই আমার রাজদরবারকে সেরা বেহেশ্‌তে পরিণত করে দিয়েছো।

তখন থেকেই আবুল কাশেম ফেরদৌসি হিসেবে সকলের কাছে পরিচিত হলেন। আবুল কাশেম নাম চাপা পড়ে গেল ফেরদৌসি নামের সামনে। সুলতান কবির জন্য আলাদা থাকার স্থান দিলেন। থাকা খাওয়ার ভাল ব্যবস্থা করে দিলেন। আর তাকেই রাজ কবি মনোনীত করলেন। আস্তে আস্তে ফেরদৌসীর সাথে সুলতানের ঘনিষ্টতা হল। দু'জনে প্রিয় বন্ধু হয়ে গেলেন। কবির জ্ঞান বুদ্ধিতে সুলতান খুবই মুগ্ধ হন।

কিন্তু তাদের এই বন্ধুত্ব স্থায়ী হলনা। ফেরদৌসীর প্রতি সুলতানের এত ভালবাসা ও তার প্রতি এত সম্মান দেখে অন্যান্য কবি ও উজির নাজিররা ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন। তারা কবিকে রাজদরবার থেকে বের করে দেবার জন্য গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। সুলতানের প্রধানমন্ত্রী খাজা ময়মন্দিও কবির বিরুদ্ধে গেলেন। তিনি গোপনে তার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

এদিকে সুলতান মাহমুদ কবিরকে শাহনামা মহাকাব্য রচনা করার অনুরোধ জানান। এর প্রতিটি শ্লোকের জন্য তিনি একটি করে স্বর্ণমুদ্রা দেবার ওয়াদা করেন। ফেরদৌসী ৩০ বছর পরিশ্রম করে শাহনামা রচনা করেন। এতে ৬০ হাজার শ্লোক আছে এবং এটি ৭টি বৃহৎ খন্ডে বিভক্ত। এই কাব্যের কোথাও কোন খারাপ কথা নেই, নেই কোন বাজে উপমা। সুলতান শাহনামার জন্য কবিকে ৬০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিতে চাইলেন। কিন্তু রাজদরবারের হিংসুটে কয়েকজন উজির সুলতানকে বললেন, এজন্যে কবিকে ৬০ হাজার রৌপ্যমুদ্রা দিলেই যথেষ্ট হবে। সুলতান তার

সভাসদদের ভেতরের হিংসা বুঝতে পারেননি। তারা যে ফেরদৌসীর প্রতি শত্রুতা করে তার ক্ষতি করতে চাইছে এটা তিনি ধরতে পারেননি। তাই তাদের পরামর্শ মত কবিকে ৬০ হাজার রৌপ্য মুদ্রা দেন। ফেরদৌসী সুলতানের ওয়াদাকৃত ৬০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা না পেয়ে রাগে দুঃখে ও ক্ষোভে কি করবেন ভেবে পেলেন না। তিনি অর্থ বা ধন দৌলতের লোভে একাজ করেননি। বরং এই অর্থ দিয়ে দীন দুঃখী মানুষের কল্যাণ করবেন এটাই ছিল তার আকাংখা।

তিনি এটাকে তার জন্য অপমান জনক বলে মনে করলেন। সুলতান তার ওয়াদা কবিকে ফেরৎ দেননি। বরং তিনি সুলতানের পাঠানো পত্রের এক কোনে আলিফ লাম ও মীম এ তিনটি অক্ষর লিখে দেন। সুলতান মাহমুদ এ তিনটি অক্ষরের অর্থ বুঝতে পারলেন না। তার রাজদরবারের কেউই এর মর্ম উদ্ধার করতে পারলো না। তখন তিনি রাজদরবারে ফেরদৌসীর অভাব অনুভব করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, আজ যদি কবি ফেরদৌসী দরবারে থাকতেন তাহলে এর অর্থ তিনি অনায়াসে বলে দিতে পারতেন। অর্থ বোঝার জন্য রাজদরবারের বাইরে যেতে হতনা।

সুলতান মাহমুদ এসময় কুহেস্তানের রাজা নসরুদ্দিনের কাছ থেকে একটি পত্র পেলেন। পত্রে কবি ফেরদৌসীর খুবই প্রশংসা করা হয়েছে। সুলতান পত্র পড়ে নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করলেন, কবি তার ওয়াদামত স্বর্ণমুদ্রা না পেয়ে দুঃখ পেয়েছেন। রাজসভার অন্যান্য কবি এবং উজির নাজির ও কবির বিরুদ্ধে ষড়ষন্ত্র করেছিল একথা বুঝতেও সুলতানের বাকী থাকলনা। তিনি প্রধানমন্ত্রী খাজা ময়মন্দিকে

www.icsbook.info

রাজপদ থেকে বিতাড়িত করেন। আর কবিকে ফিরিয়ে আনার সংকল্প করেন। তিনি কবির প্রাপ্য সমুদয় স্বর্ণমুদ্রাসহ কবির জন্মভূমি তুস নগরীতে কবির বাড়ীতে দূত পাঠান। কিন্তু তখন দেরী হয়ে গেছে। আভিমানি কবি ফেরদৌসীর তখন ইন্তেকাল হয়েছে। তার লাশ দাফনের জন্য লোকজন কাঁধে করে যখন তাকে তার বাড়ী থেকে বের করছিলেন সে সময় সুলতান মাহমুদের প্রেরিত দূত ৬০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে কবির বাড়ীতে আসছিলেন।

কবি ফেরদৌসী ৯৪১ খৃষ্টাব্দে ইরানের তুস নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০২০ খৃষ্টাব্দে এখানেই তিনি ইন্তেকাল করেন। পৃথিবীতে যে কজন হাতে গোনা মহাকবি রয়েছেন তিনি তাদের অন্যতম। বিভিন্ন ভাষায় তার মহাকাব্য শাহনামা অনুদিত হয়েছে। বিশ্বের কাব্য প্রেমিকদের কাছে তিনি চির সবুজ চির নবী এক মহাপুরুষ।

✪✪✪

www.icsbook.info

ইবনে সিনা

ইরানের একটি প্রদেশের নাম খোরাসান। এখানে শাসন করতেন আব্দুল্লাহ। তাঁর পুত্র ছিলেন ইবনে সিনা। মায়ের নাম সিতারা বিবি। ৯৮০ খৃষ্টাব্দে তুর্কীস্থানের বিখ্যাত শহর বোখারার নিকটবর্তী আফসানা গ্রামে ইবনে সিনা জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে সিনার আসল নাম আবু আলী আল হোসাইন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সিনা। তবে তিনি ইবনে সিনা, বু-আলী সিনা এবং আবু আলী মিনা নামেই বেশী পরিচিত।

পুত্রের জন্মের কিছুকাল পরেই আব্দুল্লাহ তাকে বোখারায় নিয়ে আসেন। সে সময় বোখারা ছিল মুসলিম জাহানের জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম কেন্দ্র। শিশুপুত্রের মেধাদীপ্ত কথা-বার্তায় পিতা বুঝলেন কালে এ ছেলে দুনিয়া জোড়া খ্যাতি অর্জন করবে। তাই তিনি ছেলের সুশিক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করেন।

মাত্র দশ বছরেই ইবনে সিনা পবিত্র কোরআনের ৩০ পারা মুখস্ত করে ফেলেন। তাঁর পিতা ছেলের জন্য ৩ জন গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করেন। এদের মধ্যে ইসমাইল সুফী শিখাতেন ধর্মতত্ত্ব, ফিকাহ্ ও তাফসীর। মাহমুদ মসসাহ শিক্ষা দিতেন গনিত শাস্ত্র ও বিখ্যাত দার্শনিক আল না'তেলী শিক্ষা দিতেন দর্শন, ন্যায় শাস্ত্র, জ্যামিতি, টলেমির আল মাজেস্ট জওয়াহেরে মানতেক প্রভৃতি।

এ সময় তার বয়স ১৭ বছর। তিনি তখনকার দিনে প্রচলিত সকল জ্ঞান লাভ করে ফেলেন। বিখ্যাত দার্শনিক আল নাতেলী ইবনে সিনাকে সকল বিষয়ে জ্ঞান দান করেন। তিনি ইবনে সিনাকে স্বাধীনভাবে গবেষণা করার পরামর্শ দেন।

www.icsbook.info

ইবনে সিনা চিকিৎসা বিজ্ঞানে পারদর্শীতা অর্জনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি চিকিৎসার মাধ্যমে দুঃস্থ মানবতার সেবা করার জন্য মনস্থির করেন। এজন্যে চিকিৎসা বিষয়ক যাবতীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করে তিনি গবেষণা শুরু করেন। তিনি একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন। একজন খাঁটি মুসলমান কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য যেমন নিয়ম অনুযায়ী কাজ করেন তেমনিই আবার মহান আল্লাহর কাছে বিনয় ও নম্রতার সাথে মদদ ও সাহায্য কামনা করে থাকেন। ইবনে সিনা কোন বিষয়ে যখন বুঝতে পারতেন না। তখন দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহ্ পাকের সাহায্য চাইতেন। কান্নাকাটি করে বলতেন, হে আল্লাহ্ তুমি আমার জ্ঞানের দরজাকে খুলে দাও। আল্লাহ্ পাক পরম দয়ালু। বান্দার কাতর আবেদন মঞ্জুর না করে থাকতে পারেননা। কাজেই ইবনে সিনার দোয়া কবুল হত। ইবনে সিনা যখন ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়তেন তখন অমীমাংসিত প্রশ্নগুলো তার মানসপটে স্বপ্নের মত ভাসতো। তার জ্ঞানের দরজা খুলে যেত। ঘুম থেকে উঠে তিনি সমস্যার সমাধান করে ফেলতেন।

একজন বিখ্যাত চিকিৎসক হিসাবে সর্বত্র তার নাম ছড়িয়ে পড়ে। তিনি জটিল রোগের চিকিৎসায় সাফল্য লাভ করেন। বোখারায় তখন বাদশাহ্ ছিলেন নূহ্ বিন মনসুর। তিনি একবার এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসা জগতের চুনোপুটি থেকে শুরু করে রাঘব বোয়ালদের কেউই তাকে সুস্থ্ করে তুলতে পারছিলেন না। বাদশাহ্ ইবনে সিনার সুখ্যাতি শুনেছেন। তাই তাকে ডেকে পাঠালেন। ইবনে সিনা বাদশাহ্কে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে তার রোগ সম্পর্কে অবহিত হলেন। পরে মাত্র কয়েকদিনের চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। বাদশাহ্ ইবনে সিনার ওপর খুবই খুশী হলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি পেলে খুশী হবেন? ইবনে সিনা বললেন, জাঁহাপনা

আপনার লাইব্রেরীর বই পুস্তক যদি আমাকে পাঠ করার সুযোগ দেন তবে আমি সবচেয়ে বেশী খুশী হব। বাদশাহ্ সে সুযোগ দিলেন। ইবনে সিনা লাইব্রেরীর সব বই মুখস্থ্ করে ফেলেন। মাত্র ১৯ বছর বয়সে তিনি জ্ঞানের সকল দিক ও বিভাগে অসামান্য পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, গণিত, জ্যামিতি, ন্যায়শাস্ত্র, খোদাতত্ত্ব, চিকিৎসা বিজ্ঞান, কাব্য ও সাহিত্য বিষয়ে অসীম জ্ঞান লাভ করেন। ২১ বছর বয়সে তিনিআল মুজমুয়া নামে একটি বিশ্ব কোষ রচনা করেন। এর মধ্যে গণিত ছাড়া সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করেন।

ইবনে সিনার পিতা আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেন ১০০১ সালে। এ সময় ইবনে সিনার বয়স ছিল ২২ বছর। পিতার মৃত্যুর পর তার জীবনে শুরু হয় রাজনৈতিক দুর্যোগ। তিনি সকলের অনুরোধে পিতার পদে বসেন। কিন্তু তিনি বেশী দিন খোরাসানের শাসনকর্তার পদে থাকতে পারলেন না। গজনীর সুলতান মাহমুদ খোরাসান দখল করে নেন। ফলে ১০০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি খাওয়ারিজমে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সময় খাওয়ারিজমের বাদশাহ ছিলেন মামুন বিন মাহমুদ। ইবনে সিনা সেখানে ১০১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে কাটান। ইবনে সিনার সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে গজনীর সুলতান মাহমুদ তাকে তাঁর রাজসভায় আনতে চাইলেন। সুলতান মাহমুদ জ্ঞানী গুনীদের খুব পছন্দ করতেন। তিনি তাদের সসম্মানে তার দরবারে স্থান দিতেন। তিনি পন্ডিত লোকদের মনিমুক্তা উপহার দিতেন।

সুলতান মাহমুদ ইবনে সিনার ৪০টি প্রতিকৃতি তৈরী করে সমগ্র ইরান ও এশিয়া মাইনরের রাজাদের কাছে পাঠান। ইবনে সিনাকে যেন গজনীতে পাঠানো হয় সেজন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

www.icsbook.info

খাওয়ারিজমের বাদশাহ মামুন বিন মাহমুদের কাছেও সুলতান মাহমুদের লোক এল। তার কাছে সুলতানের পত্র হস্তান্তর করা হল। পত্রে পরোক্ষভাবে নির্দেশ দেয়া হয় যাতে জ্ঞানী গুনী লোকদের গজনীর দরবারে পাঠিয়ে দেয়া হয়। ইবনে সিনা ছিলেন স্বাধীন চেতা। তাঁর আত্ম মর্যাদাবোধ ছিল প্রবল। তিনি ধন সম্পদের লোভ করতেন না। বরং জ্ঞান অর্জনই ছিল তার জীবনের লক্ষ্য। তিনি সামান্য টাকা পয়সার বিনিময়ে মান সম্মান ও স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার বিকিয়ে দিতে রাজী ছিলেন না। তিনি অন্যায় ভাবে কারো কাছে মাথা নত করতে জানতেন না।

গজনীর সুলতান মাহমুদ সেযুগে মহাপ্রতাপশালী বাদশাহ ছিলেন। তার দৌর্দন্ত প্রতাপে অন্যান্য রাজা বাদশাহগণ পর্যন্ত থরহরি কম্পমান থাকতেন। তাই গজনীতে গেলে হয়তো স্বাধীনভাবে মর্যাদার সাথে চলাফেরা করতে পারবেনা–এই ভয়ে ইবনে সিনা সেখানে যেতে চাননি।

খাওয়ারিজমে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে তিনি ১০১৫ খৃষ্টাব্দে অনিশ্চিত পথে যাত্রা শুরু করেন। প্রথমে আবিওয়াদি, পরে তুস, নিশাপুর ও শেষে গুরুগাও যান। এখানে এসে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করতে থাকনে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে কোন একস্থানে বেশী দিন থাকা তার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য তিনি ঘুরে বেড়ান গ্রাম থেকে গ্রামে-শহর থেকে শহরে। শেষে এলেন রাও প্রদেশে। সেখানে গ্রন্থ রচনা শুরু করেন। কিন্তু তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও মর্যাদা দেখে রাজার সভাসদদের মধ্যে অনেকে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। তারা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শরু করেন। এতে বিরুক্ত হয়ে তিনি প্রথমে কাজভিন এবং পরে হামাদান শহরে যান।

হামাদানে ইবনে সিনা তার বিখ্যাত গ্রন্থ আশ শিফা ও আল কানুন লেখায় হাত দেন। হামাদানে তিনি রাজনৈতিক অশ্রয় নেনে।

www.icsbook.info

সেখানকার বাদশাহ্ শাম্স-উদ-দৌলা সে সময় মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হন। ইবনে সিনা ৪০ দিন চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ্ করে তোলেন।

ইচ্ছা না থাকলেও অনেক সময় ঘটনাক্রমে অনেককে অনেক কিছু করতে হয়। ইবনে সিনাকে বাধ্য হয়ে হামাদানের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে হল। তিনি বাদশাহ্ শাম্স উদ-দৌলার মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার কারণে তিনি রাজ দরবারে অনেকের ঈর্ষার পাত্রে পরিণত হন। এ সময় তার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এমনকি তার বিরোধীপক্ষ সেনাবাহিনীকেও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে। তারা ইবনে সিনার মৃত্যুদন্ড দাবী করে। বাদশাহ্ ইবনে সিনার বিরুদ্ধে কিছু লোকের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারলেও সৈন্যদের দাবী অগ্রাহ্য করার মত অবস্থা তার ছিল না। অপর দিকে তিনি ইবনে সিনাকে হত্যা করতে পারলেন না। কাজেই ইবনে সিনাকে এ সময় ৫০ দিন লুকিয়ে থাকতে হয়। এসময় তাকে দুঃখ কষ্টের মধ্যে কাল কাটাতে হয়েছে। পরবর্তীতে বাদশাহ পুনরায় অসুস্থ্ হয়ে পড়েন। কিন্তু কোন চিকিৎসকই তার রোগ নিরাময়ে সমর্থ হলেন না। ফলে সৈন্যরা ইবনে সিনাকে খুঁজে বের করেন। তাঁর চিকিৎসায় বাদশাহ সুস্থ হলেন। আবারও ইবনে সিনাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু বাদশাহ শামস্-উদ-দৌলার ইন্তেকালের পর ইবনে সিনা ইস্পাহানে চলে যান। ইস্পাহানও ইরানের একটি প্রদেশ। সে সময় ইস্পহানের শাসক ছিলেন আলা উদ-দৌলা। তিনি ইবনে সিনাকে পেয়ে ভারী খুশী হন। ইবনে সিনার জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার যাবতীয় ব্যবস্থা তিনি করে দেন। ফলে ইবনে সিনা সেখানে শান্ত ভাবে গবেষনা কাযে নিজেকে নিয়োগ করেন। ইবনে সিনা তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ আশশেফা ও আল কানুন এর অসমাপ্ত লেখা সেখানেই শেষ করেন।

আল কানুন গ্রন্থটি চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক বিপ্লব এনে দেয়। এত বিশাল গ্রন্থ সে যুগে আর কেউ রচনা করতে পারেনি। এটি

www.icsbook.info

ল্যাটিন ইংরেজী, হিব্রু প্রভৃতি ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ইউরোপের মেডিকেল কলেজগুলোতে আল কানুন গ্রন্থটি বহুকাল যাবত পাঠ্য ছিল। আল কানুন ৫টি বিশাল খন্ডে বিভক্ত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪ লাখেরও বেশী। গ্রন্থটিতে শতাধিক জটিল রোগের কারণ, লক্ষন ও পথ্যাদির বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক হলেন ইবনে সিনা।

আশ শিফা দর্শন শাস্ত্রের একটি অমূল্য গ্রন্থ। এটি ২০ খন্ডে বিভক্ত। এতে রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রাণীতত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্ব সহ যাবতীয় বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

ইবনে সিনা পদার্থ বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, জ্যামিতি, গনিত, চিকিৎসা বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি মানুষের কল্যাণ ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য আজীবন পরিশ্রম করেন। জ্ঞানের সন্ধানে বহু জায়গা ভ্রমন করেছেন।

ইবনে সিনা-ই প্রথম মেনেনজাইটিস রোগটি সনাক্ত করেন। পানি ও ভূমির মাধ্যমে যেসব রোগ ছাড়ায় সেগুলো তিনি আবিস্কার করেন। সময়ও গতির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের কথা তিনিই প্রথম আবিস্কার করেন।

সারা জীবন পৃথবীর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে অবস্থান করে শেষ জীবনে তিনি ফিরে আসেন ইরানের হামাদানে। দিনের পর দিন গবেষণার কাজে তিনি ব্যয় করেছেন। এর ফলে তার শরীর দূর্বল হয়ে পড়েছিল। এ সময় তিনি পেটের রোগে আক্রান্ত হন। একদিন তার এক চাকর ঔষুধের সাথে আফিম মিশিয়ে দেয়। আফিমের বিষক্রিয়ায় তার জীবনী শক্তি শেষ হয়ে আসে। ১০৩৭ সালে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের জনক ইবনে সিনা ইন্তেকাল করেন। হামাদানে তাঁকে কবর দেয়া হয়।

✪✪✪

www.icsbook.info

ওমর খৈয়াম

ইরানের খোরাসান প্রদেশের রাজধানী নিশাপুর। সেখানে ১০৪৪ সালে জন্ম হয় গিয়াস উদ্দিন আবুল ফতেহ্ ওমর ইবনে ইব্রাহীম। তিনি সমগ্র বিশ্বে ওমর খৈয়াম নামে পরিচিত। খৈয়াম তার বংশগত উপাধি। এই শব্দটির মানে হচ্ছে তাঁবু নির্মাতা বা তাঁবু ব্যবসায়ী। তার বংশের কেউ হয়তো এ কাজ করতেন। সেই থেকে খৈয়াম শব্দটি তাদের নামের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেছে। ওমর খৈয়াম বিরাট পন্ডিত লোক ছিলেন। তিনি জ্ঞানের যে তাঁবু তৈরী করেছেন তাতে আশ্রয় নিয়ে বহুলোক পান্ডিত্য অর্জনে সক্ষম হয়েছেন।

ওমর খৈয়াম বিশ্বের অন্যতম সেরা জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তিনি এক সাথে অংক শাস্ত্রবিদ, চিকিসা বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ছিলেন। তিনি মনের আনন্দে ও আবেনে চতুষ্পদী কবিতা লিখতেন। এসব কবিতা রুবাইয়াত নামে খ্যাত। ইউরোপের মানুষ তাকে কবি হিসেবে চেনে ও জানে। তার কবিতাগুলো তার ইন্তেকালের ৭৩৪ বছর পর ১৮৫৭ সালে এডোয়ার্ড ফিজারেল্ড ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। ফলে তিনি ইউরোপের লোক জনের কাছে কবি হিসেবে পরিচিত হন। ওমর খৈয়ামের মনের খেয়ালে রচিত কবিতা বিশ্বের সাহিত্য অঙ্গনে তাকে অন্যতম সেরা কবির আসনে সমাসীন করেছে।

ছোট বেলা থেকেই ওমর খৈয়াম খুবই মেধাবী ও বুদ্ধিমান। পড়াশুনার প্রতি তার গভীর মনযোগ তার অসামান্য সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ। তাঁর স্মরণ শক্তি ছিল খুবই প্রখর। যেকোন দর্শন গ্রন্থ বা বিজ্ঞানের কঠিন ও জটিল গ্রন্থগুলো কয়েকবার পড়লেই তার মুখস্থ হয়ে যেত।

www.icsbook.info

তার পারিবারিক আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। জ্ঞান চর্চার জন্য আমীর আবু তাহির তাকে কিছু আর্থিক সহায়তা করেন এবং রাজ্যের সুলতান জালাল উদ্দিন মালিক শাহের প্রধানমন্ত্রীর সাথে তাকে পরিচিত করে দেন। ফলে তার আর্থিক অবস্থা কিছুটা ভাল হয়। রাষ্ট্রীয় সাহায্য পেয়ে তিনি ভোগ বিলাসে তা' ব্যবহার করেননি। তিনি রাষ্ট্রীয় সাহায্য জ্ঞান সাধনা ও গবেষণার কাজে ব্যবহার করেন। তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান, বীজগনিত ও জ্যামিতি। দর্শন শাস্ত্রে তিনি ছিলেন মস্তবড় পন্ডিত। এত বড় পন্ডিত হয়েও তার মনে কোন অহংকার ছিল না। বরং মনের মধ্যে ছিল আল্লাহর ভালবাসা। তিনি প্রতিটি কাজে কর্মে আল্লাহর স্মরণ রাখতেন। একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য তার জীবনের মূল্যবান সময় অতিবাহিত করেন। জ্ঞান চর্চার প্রতি তিনি এতই মনযোগী ছিলেন যে কোন বই হাতে পেলেই তা তিনি পড়ে শেষ করতেন।

ওমর খৈয়াম ছিলেন সে যুগের সেরা বিজ্ঞানী। সুলতান জালাল উদ্দিন মালিক শাহের অনুরোধে তিনি রাজকীয় মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই এর মহাপরিচালক নিযুক্ত হন। এসময় সুলতান তাকে একটি সঠিক সৌরবর্ষপঞ্জি তৈরীর অনুরোধ জানান। ওমর খৈয়াম মাত্র ৭ জন সহকর্মী বিজ্ঞানী নিয়ে অতি অল্পদিনে সাফল্যের সাথে ও নিখুঁতভাবে একটি সৌরপঞ্জি চালু করেন। তিনি সুলতান জালাল উদ্দিন মালিক শাহের নাম অনুসারে এর নাম দেন আততারিখ আল জালালী অব্দ। এই জালালী বর্ষপঞ্জিতে ৩৭৭০ বছরে মাত্র ১দিনের ভ্রান্তি ছিল। আর গ্রেগরীয়ান বর্ষপঞ্জিতে ভ্রান্তি ছিল ৩৩৩০ বছরে মাত্র ১ দিনের। জালালী অব্দ হিজরী ৪৭১ সালের ১০ই রমজান থেকে শুরু হয়। ওমর খৈয়াম একটি নতুন গ্রহও আবিস্কার করেন।

www.icsbook.info

বীজগনিতেই ওমর খৈয়ামের অবদান বেশী। তিনিই প্রথম বীজগণিতের সমীকরণ গুলোর শ্রেণী বিন্যাসের চেষ্টা করেন। জ্যামিতির সমাধানে বীজগণিত এবং বীজগণিত সমাধানে জ্যামিতি পদ্ধতি তারই অভূতপূর্ব আবিস্কার। ভগ্নাংশীয় সমীকরণের উল্লেখ ও সমাধান করে ওমর খৈয়ামই সর্বপ্রথম বীজগনিতে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। তাঁর বীজগনিত সম্পর্কিত গ্রন্থের নাম 'ফি আল জাবের' ওমর খৈয়াম সর্বপ্রথম বীজগনিতের ক্ষেত্রে বাইনোমিয়াল থিউরাম' আবিস্কার করেন। অথচ নিউটনকে এর আবিস্কারক মনে করা হয়। তাঁর শত শত বছর আগে বিজ্ঞানী ওমর খৈয়ামই প্রথম তা আবিস্কার করেন।

গনিতে ওমর খৈয়ামের' অবদান কম নয়। গণিত শাস্ত্রে এনালিটিক জিওমেট্রির কল্পনা তিনিই প্রথম করেন। পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে একজন গণিতবিদ একে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। এছাড়া পদার্থ বিজ্ঞানেও তার অবদান রয়েছে। ওমর খৈয়ামের মেধা ও চিন্তা শক্তি অনেক গভীর ছিল। একদিন ইমাম গাজ্জালী (রঃ) ওমর খৈয়ামকে প্রশ্ন করলেন, কোন গোলক যে অংশের সাহায্যে অক্ষের উপর ঘুরতে থাকে, গোলকের সমস্ত অংশ এক প্রকার হওয়া সত্ত্বেও এ অংশটি অন্যান্য অংশ থেকে কিভাবে আলাদা রূপে জানা সম্ভব? এ প্রশ্নের জবাবে ওমর খৈয়াম তখনই অংকের ব্যাখ্যা শুরু করেন। দুপুর থেকে শুরু করে বিকেল পর্যন্তও তার ব্যাখ্যা শেষ হয়নি। তাঁর জবাবে ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, সত্যের সন্ধান পেয়ে মিথ্যার যবনিকা অপসারিত হল। এর আগে এ বিষয়ে আমার ধারণা সঠিক ছিল না।

ওমর খৈয়াম ছিলেন একজন বিশিষ্ট চিকিৎসা বিজ্ঞানী। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানেও বহু গ্রন্থ রচনা করে যান। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ

www.icsbook.info

১। রুবাইয়াত (মরমী কবিতা) ২। মিজান-উল-হিকাম (রসায়ন বিজ্ঞান) ৩। নিজাম উল-মূলক (রাজনীতি) ৪। আল জাবরা ওয়াল মুকাবিলা (বীজগণিত), ৫। মুশফিলাত (গণিত শাস্ত্র) ৬। নাওয়াযিম আসবিনা (ঋতুপরিবর্তন বিষয়ক) ৭। আল কাউল ওয়াল তাকলিক (মানুষের নৈতিক দায়িত্ব) ৮। রিসালা মুকাবাহ ৯। দার ইলমে কুল্লিয়াত ১০। নওরোজ নামা।

ওমর খৈয়াম যেমন পন্ডিত ছিলেন-তেমনিই আল্লাহ ওয়ালা লোক ছিলেন। তিনি নিজের প্রচার করতেন না। সাদাসিধেভাবে জীবন কাটাতেন। এর ফলে তার দেশের লোকেরাও তাকে চিনতে পারেনি। তিনি যে কত বড় জ্ঞানী লোক তা অনেকেই জানতনা।

বিশ্ব বিখ্যাত বিজ্ঞানী ওমর খৈয়াম ১২২৩ খৃষ্টাব্দে ৭৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর আগে তিনি তার ছাত্রদের শেষ বারের মত বিশেষ উপদেশ দনের জন্যে আহবান জানান। এরপর তিনি ভালভাবে ওজু করেন এবং এশার নামাজ আদায় করেন। এসময় তিনি ছাত্রদের নসিহত করর কথা ভুলে যান। নামাজের শেষের সেজদায় গিয়ে তিনি কাঁদতে থাকেন। আর জোরে জোরে বলতে থাকেন, হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে মাফ চাচ্ছি। তোমার দয়া ও করুনার গুণে আমাকে মাফ করে দাও। এরপর তিনি আর মাথা তোলেননি। সেজদা অবস্থাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

✪✪✪

www.icsbook.info

মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (রঃ)

বিশ্বের অন্যতম সেরা সাধক কবি জালাল উদ্দিন রুমী (রহঃ) এর পিতার নাম বাহাউদ্দিন ওয়ালিদ। তিনি ছিলেন সে সময়কার বিখ্যাত কবি ও দরবেশ। ইরানের রুম দেশের অন্তর্গত কুনিয়ার শাসক আলাউদ্দিন কায়কোবাদ দরবেশ বাহাউদ্দিনকে কুনিয়ায় আসার দাওয়াত দেন। দাওয়াত পেয়ে বাহাউদ্দিন সপরিবারে কুনিয়ায় চলে আসেন এবং সেখানে স্থায়ীভাব বসবাস করতে থাকেন। রুম প্রদেশের নাম অনুসারে জালালউদ্দিন রুমী নামে খ্যাতি লাভ করেন।

জালালউদ্দিন ১২০৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর বলখ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তার মধ্যে অলৌকিক বিষয় দেখা যেত। তিনি খেলাধুলা ও আমোদ প্রমোদে লিপ্ত থাকা পছন্দ করতেন না। বরং ধর্মীয় আলোচনা প্রছন্দ করতেন। ৬ বছর বয়স থেকে রোজা রাখতে শুরু করেন। ৭ বছর বয়সে তিনি সুমধুর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করতেন। এ সময় তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তো।

৬ বছর বয়সে তিনি পিতার সাথে ভ্রমনে যান। নিশাপুরে গিয়ে বিখ্যাত কবি ও সুফী সাধক শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তারের সাথে সাক্ষাৎ করেন। শেখ ফরিদ উদ্দিন আত্তার বালক জালাল উদ্দিনের চেহারা দেখে তার উজ্জল ভবিষ্যত বুঝতে পেরে তার জন্য দোওয়া করেন। তিনি তার প্রতি বিশেষ নজর রাখার জন্য পিতার প্রতি উপদেশ দেন। নিশাপুর ছেড়ে পিতা বাহাউদ্দিন পুত্র জালাল উদ্দিনকে সাথে নিয়ে হজ্ব পালন করেন। পরে বাগদাদ সহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমন করেন। এ সফর কালে পিতা পুত্রকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দান করেন।

www.icsbook.info

১২৩১ সালে বাহাউদ্দিন ইন্তেকাল করেন। পিতার মৃত্যুতে জালাল উদ্দিন ভেঙ্গে পড়লেন। এর ফলে তার পড়ালেখায় বিঘ্ন ঘটে। পিতার মৃত্যুর আগে মাও ইন্তেকাল করেছিলেন। ফলে তিনি একদম এতিম হয়ে পড়েন। এ সময় তার পিতার ছাত্র ও মুরিদ সৈয়দ বোরহান উদ্দিন তার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তিনি জালালউদ্দিনকে আবার পড়া লেখায় নিয়োজিত করলেন। তিনি তাঁকে ৭/৮ বছর পর্যন্ত শিক্ষাদান করেন।

উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য তিনি চলে যান সিরিয়ায়। দামেস্কে গিয়ে তিনি সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ বছর পড়ালেখা করেন। এরপর ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত জ্ঞানের সন্ধানে তিনি নানান দেশে যান। যেসব বিখ্যাত সাধক ও পন্ডিতদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয় তাদের মধ্যে ছিলেন, সাধক শামসুদ্দিন তাব্রীজ (রহঃ) ইবনে আল আরাবী (রহঃ) সালাউদ্দিন ও হুসামউদ্দিন। এসব ব্যক্তি তার সময়ের শ্রেষ্ঠ পন্ডিত ও সাধক ছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে জ্ঞানীরূপে গড়ে তোলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার লোক তাঁর কাছে আসতে থাকে। তিনি তাদের শিক্ষা দান করেন। তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ্ রচনা করেন। এর মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হল, মসনবী ও দিওয়ান। এ দু'টি গ্রন্থ্ তাকে অমর করে রেখেছে। বাংলা ভাষাসহ বিভিন্ন ভাষায় এই মসনবীর অনুবাদ হয়েছে। ইরানে পবিত্র কোরআন ও হাদিসের পর মসনবীকে যথার্থ পথ প্রদর্শক বলে মনে করা হয়। দিওয়ানে রয়েছে ৫০ হাজার শ্লোক। এগুলো সবই আধ্যাত্মিক গজল।

জালালউদ্দিন ছিলেন মহাপন্ডিত। একই সাথে তিনি তাঁর মাবুদ আল্লাহ পাককে সঠিকভাবে চিনতে পেরেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি যুক্তি তর্ককে প্রধান্য দেননি। বরং বিশ্বাস ও

www.icsbook.info

ভক্তির উপর জোর দিয়েছেন। তিনি স্রষ্টাকে ভালবাসার মাধ্যমে পেতে চেয়েছেন। আর সেভাবেই তাকে তিনি লাভ করেছেন।

খোদাকে চেনার জ্ঞানকে বলা হয় ইলমে মারেফাত। আর খোদার দেয়া বিশেষ জ্ঞানকে বলা হয় ইলমে লাদুনি। এই জ্ঞান থাকলে যেকোন বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে নেয়া যায়। জালাল উদ্দিনের মধ্যে এ দুটি জ্ঞানই পুরা মাত্রায় ছিল।

মানুষের দেহ মানবাত্মা ও আল্লাহর মধ্যে মিলনের সবচেয়ে বড় বাধা। দেহের মধ্যে যে কামনা ও বাসনা রয়েছে তা মানুষকে সব সময় সত্যপথ থেকে আলাদা করে দেয়- যা মানুষকে ব্যক্তিত্ব বা অহংকার প্রদান করে এবং তাকে ভোগ করার লিপ্সায় মত্ত করে দেয়। এই জৈব আকাংখার নাম নফ্স। নফস কে ধ্বংস করলে দেহের কর্তৃত্ব আর থাকেনা। এর ফলে আত্মার স্বাধীনতা পূর্ণতা লাভ করে। তাই নফসের বিরুদ্ধে মানুষকে আজীবন সংগ্রাম করে যেতে হয়। জালালউদ্দিনও তার সারাটা জীবন নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন।

জালাল উদ্দিন মনে করতেন বুদ্ধি, যুক্তি ও ভক্তি এক নয়। বুদ্ধি ও যুক্তি দিযে আল্লাহকে চেনা বোঝা ও পাওয়া যায় না। এর জন্য প্রয়োজন বিশ্বাস ও ভক্তি। ভক্তি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ভালবাসার পথ। আর ভক্তির উৎস হল প্রেম ও আসক্তি। তাঁর মতে আল্লাহকে বুঝতে ও চিনতে হলে ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রয়োজন। তাহলেই মন দিয়ে আল্লাহকে বুঝতে পারবে। মানুষ যখন মারেফাতের উঁচু স্তরে উঠে তার নিজেজর মধ্যে আল্লাহর প্রকাশ অনুভব করে তখন তার ব্যক্তিত্বের সীমারেখা কোথায় ভেসে চলে যায়। তিনি তখন সসীম হয়েও অসীমের ভেতর নিজেকে হারিয়ে ফেলেন। অন্য কথায় বলা যায় তিনি নিজের সীমার ভেতরেই অসীমের সন্ধান পান। তখন তিনি চরম আনন্দ লাভ করেন। এ সময় পৃথিবীর সকল ধন ঐশ্বর্য্য ও তার কাছে অসার বলে মনে হয়। মারেফাতের স্তর আর বাড়লে এমন এক

পর্যায় আসে যখন মানুষের আত্মা ও আল্লাহর মধ্যে আর কোন ভেদাভেদ থাকেনা। অবস্থার নাম হল-হাল। মওলানা জালাল উদ্দিন রুমীই এসব কথা মানুষকে জানিয়েছেন। এই পৃথিবীতে থেকে মানুষের দেহ বজায় রেখে বান্দা কিভাবে আল্লাহ পাকের সাথে মিলে যেতে পারে তার নজিরও তিনি দেখিয়েছেন।

তিনি ভাগ্য ও পুরস্কার সমস্যার সহজ সমাধান দিয়েছেন। তিনি বলেন, মানুষের সব কাজের নিয়ন্ত্রন কারী আল্লাহ। আল্লাহ মানুষকে কতগুলো কাজের স্বাধীনতা দিয়েছেন। মানুষ এসব বিষয়ে নিজেই তার কর্মপন্থা নির্ধারনের অধিকার রাখে। এসব কাজের ফলাফলের জন্যও মানুষ দায়ী। কারণ এগুলো করা বা না করার এখতিয়ার মানুষকে দেয়া হয়েছে। অবশ্য কর্মকরার শক্তি আল্লাহই তাকে দিয়েছেন। জালাল উদ্দিন এসব বিষয় সুন্দরভাবে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি নিজেও যেমন পণ্ডিত ছিলেন তেমনিই ছিলেন মহাসাধক। তিনি ছিলেন খোদার প্রেমে পাগল মহান এক ব্যক্তি।

জালালউদ্দিন সাদাসিধে ভাবে চলাফেরা করতেন। যতটুকু না হলে চলে না ততটুকুই তিনি ব্যবহার করতেন। কোন কিছুতেই তার চাকচিক্য বা জাঁকজমক ছিল না । তিনি দুনিয়ার ধন সম্পদ আর মালসামানাকে কোন গুরুত্ব দিতেন না । ভোগ বিলাস তো দূরের কথা । তিনি প্রয়োজনের চেয়ে সামান্য বেশী সম্পদও গ্রহণ করতেন না। তিনি খোদাকে চেনা ও জানার এবং তার সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এ কারণে তার কাছে দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ তুচছ বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। তার ইন্তেকালের সময় তার সঞ্চিত কোন ধন সম্পদ ছিল না।

সারা জীবন তিনি জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী নিজেকে পারিচালিত করেছেন। এভাবে ৬৬ বছর বয়সে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। জালাল উদ্দিন অসুস্থ।

www.icsbook.info

একথা সর্বত্র রাষ্ট্র হয়ে পড়লো। এর ফলে তার অগনিত ভক্ত চারদিক থেকে ছুটে আসল তার কাছে। সে যুগের বড় বড় চিকিৎসকরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলেন তার চিকিৎসা করতে। এদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসক শেখ সদরুদ্দিন, আকমল উদ্দিন ও গজনফার। কিন্তু তারা ব্যর্থ হলেন। তাদের চিকিৎসা এই খোদা প্রেমিকের দেহে কোন কাজেই এল না। এ সময় জালালউদ্দিন চিকিৎসক শেখ সদরুদ্দিনকে লক্ষ্য করে বললেন, আশেক ও মাশুকের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে একটি মাত্র পর্দার। আশেক চাচ্ছে তার মাশুকের কাছে চলে যেতে। পর্দাটা যেন দ্রুত উঠে যায়। শেখ সদরুদ্দিন বুঝতে পারলেন, জালালউদ্দিন এই পৃথিবী ছেড়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হতে চাচ্ছেন। তাঁর আয়ু শেষ হবার পথে। জালাল উদ্দিন তার মাশুক আল্লাহর কাছে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় তিনি তার ভক্ত মুরিদদের সান্তনা দিয়ে কিছু উপদেশ দিলেন।

তিনি বললেন, নিজের মন মত চলা বাদ দিতে হবে। পাপ পথ ছাড়তে হবে। নামাজ ও রোজা কখনো কাযা করা যাবে না। মনের মধ্যেও যেমন আল্লাহর ভয় রাখতে হবে তেমনিই বাইরেও আল্লাহর ভয় থাকতে হবে। বিপদ এলে সবর করতে হবে। বিদ্রোহ ও প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা রাখা চলবে না। ঘুম এবং কথা বলার ব্যাপারে সংযম অবলম্বন করতে হবে। কাউকে কোন রকম কষ্ট দেয়া যাবে না। সব সময় সৎ লোকদের সাথে থাকতে হবে। যার দ্বারা দেশ ও জাতির কল্যাণ হয় সে রকম মানুষই শ্রেষ্ঠ। তিনি আরো বলেন, মানুষের দেহ নশ্বর। কিন্তু তার আত্মা অবিনশ্বর। দেহ ধ্বংস হবে। কিন্তু আত্মা বা রুহের কোন ধ্বংস নেই। জালালউদ্দিন ১২৭৩ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর ইন্তেকাল করেন।

✪✪✪

www.icsbook.info

প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এরপর আর কোন নবী রাসূল আসবেন না। যুগে যুগে পথ হারা মানুষের সামনে আদর্শবাদী ও সুন্দর চরিত্রের মানুষ আসবেন। তারা মহানবীর উম্মতের মধ্য থেকেই আসবেন। তারা নতুন কোন ধর্ম বা আদর্শ প্রচার করবেন না। বরং ইসলামের সত্যকেই নিজেদের জীবন দিয়ে সকলের সামনে সুন্দর ভাবে তুলে ধরবেন। তাদের চরিত্র ও স্বভাব হবে মার্জিত, আকর্ষণীয় ও অনুপম। তাদের চরিত্র, স্বভাব ও জীবন যাত্রা দেখে কোটি কোটি মানুষ ফিরে আসবে সত্য ও ন্যায়ের পথে। ইমাম গাজ্জালীও ছিলেন তাদেরই একজন।

সেটা ছিল একাদশ শতাব্দী। এ সময় মানুষ অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার ও নানা পাপ কাজে লিপ্ত হতে শুরু করে। অপর দিকে শিক্ষিত যুব সমাজ পাশ্চাত্যের অমুসলিম দার্শনিকদের ভ্রান্ত মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে ইসলামের সত্য পথ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিল। এসময় সত্য ও সুন্দরের ঝান্ডা নিয়ে আলোর মশাল হাতে করে এগিয়ে এলেন মুজাহিদ ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)।

ইরানের একটি প্রদেশের নাম খোরাসান। এই খোরাসানের তুস নগরীতে ১০৫৮ খৃষ্টাব্দে ইমাম গাজ্জালী জন্ম গ্রহণ করেন। ইমাম গাজ্জালীর আসল নাম আবু হামেদ মোহাম্মদ গাজ্জালী। কিন্তু সকলের কাছে তিনি ইমাম গাজ্জালী নামেই পরিচিত। 'গাজ্জাল' শব্দের মানে হচ্ছে সুতা কাটা। এটা তার বংশগত উপাধি। সম্ভবত তাঁর পিতা বা তাদের বংশের কেউ সূতার ব্যবসা করতেন। এ কারণেই লোকজন তাদের বংশকে গাজ্জালী বলেই ডাকতো।

www.icsbook.info

ইমাম গাজ্জালীর পিতা ছিলেন গরীব। এর উপর শৈশবেই তিনি পিতাকে হারান। তাঁর মা অনেক কষ্ট করে তাকে লালন পালন করেন। পিতার ইন্তেকালে তিনি এতিম হয়ে পড়লেও মনের সাহস হারাননি। জ্ঞান লাভের প্রতি ছিল তার খুবই আগ্রহ। জ্ঞান অর্জনের সাধনায় তিনি খাবার দাবার বা ভাল পোষাকের প্রতি কোন খেয়াল করেননি।

সে সময় দু'জন আলেম জ্ঞান সাধক হিসেবে বিখ্যাত হন। এদের একজন হলে হযরত আহমদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ বারকানী এবং অপরজন হচ্ছেন হযরত আবু নসর ইসমাইল। আবু হামেদ এই দুই শিক্ষকের কাছে কোরআন, হাদীস, ফেকাহ ও বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। কিন্তু তিনি এতেও সন্তুষ্ট হলেন না। আরো জ্ঞান অর্জনের জন্য পাগল পারা হয়ে ছুটলেন নিশাপুরের নিযামিয়া মাদ্রাসায়। সেকালে এই নিশাপুর ছিল জ্ঞান বিজ্ঞানের পীঠস্থান। এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পৃথিবীর প্রথম বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল ছিলেন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আব্দুল মালিক (রঃ)। আবু হামেদ তাঁর নিকট ইসলামী দর্শন, আইন ও নানান বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন।

আব্দুল মালিকের ইন্তেকালের পর আবু হামেদ চলে আসেন বাগদাদে। এখানে ছিল বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তিনি একটিতে অধ্যাপনা শুরু করেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি গবেষণা চালাতে থাকেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানে তার সুনাম আর সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

কিন্তু তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছেন তার মধ্যেই নিজেকে তৃপ্তবোধ করতে পারলেন না। সর্বদাই তার মনে একটা ব্যকুলতা একটা অতৃপ্তি-তিনি মহান আল্লাহপাককে এখনো পাননি। তাকে

গভীর ভাবে পাওয়ার জন্য তিনি সুখের চাকুরী ছেড়ে দিলেন। কষ্ট আর দুঃখের পথে বের হয়ে পড়লেন। এ পথে যাওয়ার জন্য কেউ তার সামনে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। ধন-সম্পদ ঘর বাড়ী কোন কিছুই তাকে বেধে রাখতে পারেনি। দশটি বছর তিনি আপন ভোলা খোদা প্রেমিক দরবেশের মত ঘুরে বেড়ান নানান দেশে। এ সময় আল্লাহর এবাদত জিকির, আজকার, মোরাকাবা, শিক্ষাদান ও জ্ঞান অর্জনের মধ্যদিয়ে তার সময় কাটাতে থাকেন। জেরুজালেম থেকে মদীনায় যান। প্রিয়নবীর মাজার জিয়ারত করে মক্কায় চলে আসেন। সেখানে হজ্বপালন করেন। পরে আলেকজান্দ্রিয়ায় যান। বেশ কিছুদিন সেখানে থাকেন। পরে ফিরে আসেন মাতৃভূমি ইরানে।

আবু হামেদ সত্যিকার জ্ঞানী ছিলেন। তিনি আল্লাহর পরিচয় ও সৃষ্টি রহস্য খুব ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন, আত্মা বা রুহ সৃষ্টি রহস্য আর আল্লাহর অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্ক দিয়ে মীমাংসা করা যাবে না। এরকম চেষ্টা করা নির্বোধের কাজ এবং তা' অন্যায়। তিনি সকল প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন কোরআন, হাদিস দ্বারা। এছাড়া কোরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে গবেষণা চালিয়ে তিনি অনেক প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন।

আল্লাহর প্রতি সুগভীর বিশ্বাস ও দ্বীন ইসলামের প্রতি তার আস্থা ছিল পর্বতের মত অটুট। ধর্ম ও দর্শনে আবু হামেদ ছিলেন মহাপন্ডিত। তার পরেও তিনি ছিলেন বিনয়ী ও নম্র। তিনি বলেন, আত্মা কখনো ধ্বংস হয় না, বরং দেহ ধ্বংস হয়। মৃত্যুর পরেও আত্মা জীবিত থাকে। কল্‌ব বা হৃদপিন্ডের সাথে আত্মার কোন সম্পর্ক নেই। হৃদপিন্ড একটা মাংসপিন্ড ছাড়া আর কিছু নয়। মৃত্যুর পরেও দেহে এর অস্তিত্ব যাকে। কিন্তু আত্মা মৃতদেহে

www.icsbook.info

থাকেনা। মৃত্যুর পর আত্মার পূর্ণ উৎকর্ষ ও মুক্তি সম্ভব হয়। আবু হামেদ জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের সঠিক রূপায়ন ঘটিয়েছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে কোনটি গ্রহনীয় আর কোনটি বর্জনীয় তা' তিনি চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। যা চিরন্তন সত্য ও বাস্তব সেখানে তিনি যুক্তিকে প্রাধান্য দিতেন না। বরং সেক্ষেত্রে তিনি ভক্তি ও অনুভূতির প্রতিই গুরুত্ব দিতেন বেশী।

আবু হামেদ অংকশাস্ত্র ও জ্যোতিবিজ্ঞানে অসাধারণ পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি নক্ষত্র সমূহের গতি প্রকৃতি সম্পর্কে ২টি গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় চার হাজার গ্রন্থ রচনা করেন। তার বেশীর ভাগ গ্রন্থ ইউরোপে ল্যাটিন হিব্রু ও ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। তার লেখা গোটা ইউরোপে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে (১) এহিয়া উল উলুমুদদীন (২) কিমিয়ায়ে সায়াদাত বা সৌভাগ্যের পরশমনি। (৩) কিতাবুল মনফিদলিন আদদালাল (৪) কিতাবুত তাকাফাতুল ফালাসিফা (৫) মিশকাতুল আনোয়ার (৬) ইয়াক্কুত্তাবলিগ (৭) মনখুল। এসব বই ইউরোপে অনুদিত হয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে। আবু হামেদের এসব গ্রন্থ ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এর ফলে সে সময় মুসলমান যুব সমাজ সঠিক পথের সন্ধান লাভে সক্ষম হয়।

আবু হামেদ সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতেন। আল্লাহকে পাবার জন্য তিনি ঘরবাড়ি ছেড়েছেন। আল্লাহকে খুশী করার জন্য তিনি সারাটা জীবন দেশ বিদেশে আত্মহারা হয়ে ঘুরেছেন। মৃত্যুই বান্দা ও আল্লাহর মধ্যকার পর্দাকে সরিয়ে

www.icsbook.info

দেয়। তিনি তার মৃত্যুর আগমনবার্তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই যেদিন তার পৃথিবী ছাড়ার সময় হল তিনি তা' বুঝতে পারলেন। সেটা ছিল ১১১১ খৃঃ। তার কোন অসুখ ছিল না। বরং সুস্থই ছিলেন তিনি। ভোরে ঘুম থেকে উঠে তিনি ফজরের নামাজ আদায় করেন। ইতোপূর্বে কাফনের কাপড় নিজ হাতে তৈরী করেছিলেন। সে কাপড়টি বের করে বললেন, হে আল্লাহ, তুমি আমাকে মাফ করে দাও। তুমি তো রহমান ও রাহীম। হে আল্লাহ এক মাত্র তোমাকে পাবার জন্য এবং তোমাকে চেনার জন্যই আমি সব আরাম আয়েশ ছেড়ে পথে পথে ঘুরে ফিরেছি বছরের পর বছর পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। তুমি আমাকে মাফ করে দাও।

এরপর তিনি কাফনের কাপড় পরেন ও ইন্তেকাল করেন। তিনি পৃথিবী ছেড়ে গেলেও চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন সত্য ও সুন্দরের সাধক মানুষের কাছে।

✪✪✪

www.icsbook.info

মহাকবি হাফিজ

ইরানের সিরাজনগরী। বাহাউদ্দিন সিরাজ এর অধিবাসী। তিনি একজন ব্যবসায়ী। তার ঘরে জন্মগ্রহণ করে এক ফুটফুটে ছেলে। চেহারা যেন সূর্যের আলোর মত উজ্জ্বল। দেখলে চোখ ফেরানো যায় না। পিতা আদর করে নাম রাখলেন শামসুদ্দীন। অর্থাৎ দ্বীনের সূর্য্য। তাদের পরিবারটি ধর্মকর্মে নিষ্ঠাবান। ইসলামের যাবতীয় হুকুম আহকাম সঠিকভাবে মেনে চলেন। একারনে পিতার মনের ইচ্ছা এই ছেলে শুধুমাত্র চেহারা সুরতে সুন্দর হলেই চলবে না, বরং তাকে হতে হবে একজন সত্যিকার জ্ঞানী লোক। যিনি আল্লাহকে চিনতে পারবেন আর নেক আমলের দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ ও মঙ্গল করবেন।

শামসুদ্দিনের পরিবারের সকলেই নামাজ রোজা ও অন্যান্য এবাদত বন্দেগীতে পাকা ছিলেন। তিনি এই পরিবেশেই বড় হতে থাকেন। ছোট বেলাতে তাকে কোরআন পড়তে পাঠানো হয়। তিনি অল্পদিনেই তা মুখস্থ করে ফেলেন। এ কারনে তাকে সকলে হাফিজ বলে ডাকতো।

শামসুদ্দিনকে শিক্ষালাভের জন্য বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। তিনি কম সময়ের মধ্যে আরবী ও ফারসী ভাষায় গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। ছোট বেলা থেকেই তিনি ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান ও মেধাবী। হঠাৎ করে তাদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে যায়। ফলে তাকে লেখাপড়া বন্ধ করে দিতে হয়। দারিদ্রের কারণে তার পক্ষে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হল না। বাধ্য হয়ে

www.icsbook.info

তাকে অর্থ উপার্জনের দিকে মনযোগ দিতে হল। তিনি সিরাজনগরে একটি নব প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষদান শুরু করেন। দীর্ঘদিন এখানে তিনি শিক্ষাকতা করেন। এসময় তিনি গজল ও কবিতা রচনা করতেন।

একবার তিনি 'বাবা কোহী' নামের এক বিখ্যাত দরবেশের মাজারে যান। সেখানে তিনি নীরবে আল্লাহপাকের কাছে নিজের দুরবস্থা ও দুঃখের কথা প্রকাশ করলেন। এ সময় তার চোখ থেকে অশ্রু বের হতে লাগল। তিনি পরদিন রাতে স্বপ্ন দেখলেন, একজন দরবেশ যেন তাকে কিছু খেতে দিলেন। তিনি তা' খেলেন। এরপর দরবেশে তাকে বললেন, যাও এখন হতে সব দরজাই তোমার জন্য খোলা। পরদিন সকালেই তিনি অবিশ্বাস্য একটি সুন্দর গজল রচনা করলেন। চারদিকে তার গজলের প্রশংসা শুরু হল। এরপর তিনি জনগণের কাছে কবি হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। সারা ইরানে তার সুখ্যাতি ও সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

তাঁর আসল নাম শামসুদ্দিনের কথা লোকে ভুলে গেল। সকলেই তাকে হাফিজ বলেই চেনে। তিনি সহজ সরল জীবন যাপন পছন্দ করতেন। রাজকীয় আড়ম্বর মোটেই পছন্দ হত না। এজন্য রাজাবাদশাহদের কাছ থেকে দূরে থাকতেন। একবার বাগদাদের খলিফা সুলতান আহমদ তাকে রাজ দরবার ডেকে পাঠালেন। কিন্তু তিনি কবিকে পেলেন না। এতে ক্ষুব্ধ হলেও তিনি অবিবেচক ছিলেন না। তাই উপহার সামগ্রী হাফিজের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন।

কবি হাফিজের কবিতায় রয়েছে জ্ঞানের অতুলনীয় রত্মভান্ডার। বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব জীবনের গভীর রহস্য তার কবিতার প্রতিটি বাক্যে ফুটে ওঠেছে। এর মধ্যে 'দেওয়ান-ই হাফিজ' দুনিয়া জোড়া সাড়া জাগানো এক পুস্তক। হাফিজ

মূলতঃ গীতি কবিতা লিখতেন। এর মধ্যে কোনটা সনেট জাতীয় আবার কোনটা গজল। দেওয়ান-ই হাফিজ' এর কবিতা ও গজল গুলো যেন প্রেমের এক অমর কাব্য। কবি তার জীবন কালে তার লেখাগুলো একত্রিত করে যাননি। জনপ্রিয় গজল হিসেবে সেগুলো মানুষের মুখে মুখে শোনা যেত। তার বন্ধু গুল আন্দাম সেগুলো সংগ্রহ ও সংকলন করেন। এর সংখ্যা পাঁচ শতাধিক।

কবি হাফিজ যখন যুবক। তার গজল ও কবিতা রচিত হবার পর পরেই তা মানুষের মুখে মুখে ফেরে। বিশেষ করে যুবক ও তরুনরা কবির এসব কবিতার ভক্ত। সিরাজনগরীতে শাখে নাবাত নামে এক সুন্দরী মহিলা থাকতেন। তিনি হাফিজের কবিতা পড়ে তার প্রেমে পড়ে যান। কবি হাফিজ একথা জানতে পেরে তাঁকে দেখেন এবং পছন্দ করে বিয়ে করেন। তাদের দাম্পত্য জীবন সুখেই কাটছিল। কিন্তু হঠাৎ করে কবি পত্নী ইন্তেকাল করলেন। এর ফলে কবির হৃদয় রাজ্যে তুমুল ঝড় সৃষ্টি হয়। তার জীবন দুঃখ কষ্টে ভরে যায়। এরপর কবি আর বিয়ে করেননি।

হাফিজ জীবিত কালই অনেকের বিরাগভাজন হন। তারা তার নামে নানান অপপ্রচার চালায়। কবিও তার নিন্দুকদের প্রতি কটাক্ষ করে কবিতা রচনা করেন। হাফিজ সে সময় প্রচলিত অনেক রীতিনীতিকে মেনে নিতে পারেননি। তিনি যুক্ত তর্ক দিয়ে সে সবের সমালোচনা করতেন। অনেকে তার এসব সমালোচনা পছন্দ করত না।

কবি তার পত্নী শাখে নাবাতকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। পত্নীর স্মরণে তিনি রচনা করছেন বহু প্রেমের কবিতা ও গজল। তার স্মৃতিকে ধরে রেখে তিনি বাকী জীবনটা কাটিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, তোমার ভালবাসা আমার মন ও প্রাণের কাষ্ঠফলক থেকে কখনো মুছে যাবার নয়। তোমার প্রেমের মাধুরী আমার স্মৃতি হতে কখনো দূরীভূত হবার নয়।

www.icsbook.info

কবি আরো বলেন, তোমার প্রেম আমার মনপ্রান এমন ভাবে অধিকার করে বসেছে যে আমার মাথাও যদি কেটে নেয় তথাপি আমার প্রাণ হতে তোমার ভালবাসা আলাদা হবে না।

সে যুগে ধর্মের নামে অনেকে বাড়াবাড়ি করতেন। সে যুগে প্রচলিত ৪টি মজহাব কবি মানতেন না। তিনি খোদা প্রেমে বিভোর ছিলেন। তাই সহজভাবে তিনি নিজেকে সকল মজহাব থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন। অনেকে তাকে জিজ্ঞেস করতো–আপনি কোন মজহাবের মুসলমান। জবাবে তিনি বলেন,

নহি হানাফী, শা'ফী, হাম্বলী, মালেকী
প্রেম মম এক ধর্ম, অন্য কিছু নাহি জানি।

তিনি প্রেমের মাধ্যমে আল্লাহকে পেতে চাইতেন। এজন্য বাস্তব জীবনে নামাজরোজা ও ইসলামের অন্যসকল নিয়ম কানুন যথাযথভাবে পালন করতেন।

কবি হাফিজ ১৩৮৯ সালে সিরাজনগরে ইন্তেকাল করেন। তবে ইন্তেকালের পর তার দাফন নিয়ে শুরু হয় বিতর্ক। কেউ কেউ কবির জানাজা পড়তে রাজী হলেন না। কবি নিজেকে পাপী মাতাল বলেছেন। এ কারণেই তাদের এই মনভাব। অথচ কবিতায় এসব শব্দ রূপক হিসেবে ব্যবহার হতে পারে। মাতাল মদ খেয়ে নেশা করলেই হয় না। এ শব্দটি প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। যেমন– তোমার প্রেমের শরাব পানে আমি হয়েছি মাতাল। এখানে শরাব বলতে মদ বোঝায় না আবার মাতাল বলতে মদ খোরকে বোঝায় না।

কবি হাফিজের লাশ পড়ে আছে। কিন্তু বিরোধ বেধেছে তিনি সত্যিকার খাঁটি মুসলমান কিনা তা নির্ধারণ করা নিয়ে। একদল বলছে, এতে কোনই সন্দেহ নেই তিনি একজন ভাল

মুসলমান। অপর দল তাঁকে প্রকৃত মুসলমান বলে মানতে রাজী নয়। এই বিরোধের ব্যাপারে শালিস বসলো। সিদ্ধান্ত হল, কোন এক ব্যক্তি কবির একটি কাব্য সংকলন খুলবেন যেখানে কবির ঈমানের সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে।

হাফিজের কাব্যগ্রন্থ খোলা হয়। সেখানে যে শ্লোকটি রয়েছে তা'তে সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। কবি লিখে গেছেন,

ফিরায়ে দিওনা ক্ষোভ ভরে, চরন তোমার
হাফিজের জানাজা হতে
হতে প্যারে সেপাপ পঙ্কে নিমজ্জিত
কিন্তু জান্নাতে সে যাবে।

এরপর আর কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই মিলে মহা সমারোহে কবির জানাজা ও দাফন কাজ সম্পন্ন করলেন। সিরাজনগরের ৩ কিলোমিটার দূরে একটি গাছের নীচে তার কবর দেয়া হয়। পরবর্তীকালে মোগল সম্রাট বাবর সিরাজনগর দখল করে হাফিজের কবর সুন্দরভাবে সাজিয়ে দেন। তিনি সেখানে সমাধি স্তম্ভও নির্মাণ করান। সেখানে বহুমূল্যবান কালপাথরে কবির লেখা কিছু কবিতা খোদাই করে সমাধি স্তম্ভে লাগিয়ে দেয়া হয়। পারস্র সম্রাট খান জান্দ কবির মাজারের আরো সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেন। কবির সমাধির চারদিকে রয়েছে বাগান। হাফিজের প্রিয় সাইপ্রেস গাছ এ বাগানে শোভা পাচ্ছে।

বর্তমানে কবি হাফিজের নাম অনুসারে ঐ স্থানের নাম করণ করা হয়েছে হাফিজিয়া। কবি আজ চির নিদ্রায় শায়িত। বর্তমানে দেশ বিদেশ থেকে হাজার হাজার লোক এসে মাজার জেয়ারত করে। কবির সমালোচকরা মহাকালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু কবির গজল ও কবিতা টিকে আছে। আজও মানুষ ভক্তিভরে দিওয়ান-ই-হাফিজ পাঠ করে। আজ জ্ঞানী গুণী ও পন্ডিতরা কবির অমর ও শাশ্বত প্রেমের কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে পড়েন।

✪✪✪

www.icsbook.info

আল বেরুনী

ইরানের একটি স্থানের নাম বেরুন। সেখানে জন্ম হয় আবু রায়হানের। সেটা ছিল ৯৭৩ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর। তাঁর আসল নাম ছিল আবুরায়হান মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল বেরুনী। ইতিহাসে তিনি বেরুনী নামে সবচেয়ে বেশী পরিচিত হন।

তাঁর বাল্যকাল কাটে বাদশাহ আবু মনসুর বিন আলী বিন ইরাকের তত্ত্বাবধানে। তাঁর নিযুক্ত শিক্ষকের কাছে তিনি পবিত্র কোরআন ও হাদিস শিক্ষা করেন। পরে জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখার নাম করা পণ্ডিতদের কাছে তিনি সকল বিষয়ে অসাধারন জ্ঞান অর্জন করেন। ২২বছর পর্যন্ত শিক্ষালাভ করে তিনি বিখ্যাত ব্যক্তিতে পরিনত হন।

আব্বাসীয় বংশের খলিফারা তখন মুসলমান বিশ্বের নেতা ছিলেন। কিন্তু খলিফাদের অযোগ্যতা ও দুর্বলতার কারণে তাদের সাম্রাজ্যে গোলযোগ দেখা দেয় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে স্বাধীন রাজাদের উদ্ভব হয়। এসময় খাওয়ারিজম প্রদেশেও দু'জন রাজা রাজত্ব করতেন। এদের একজন হলেন দক্ষিনাংশের আবু আব্দুল্লাহ এবং উত্তরাংশের মামুন বিন মাহমুদ। আবু আব্দুল্লাহ আল বেরুনীর দেখাশুনা করতেন। ৯৯৫ খৃষ্টাব্দে মামুন বিন মাহমুদ আবু আব্দুল্লাহকে পরাজিত করে হত্যা করেন। এর ফলে তার রাজত্বও মামুনের হাতে চলে আসে। এর ফলে আল বেরুনী এর ফলে আল বেরুনী অভিভাবকহীন হয়ে পড়েন। তিনি খাওয়ারিজম ছেড়ে চলে যান। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তাকে অনাহারে আর অর্ধাহারে থাকতে হয়েছে। কিন্তু তিনি পথে নেমেছেন তাকে

www.icsbook.info

চলতেই হবে। এসময় জুরজানে পৌঁছে সেখানকার রাজা কাবুসের সুনজরে তিনি পড়েন। রাজা জানতে পারেন এই পথিক বিশ্ববিখ্যাত পন্ডিত আল বেরুনী। তাঁর নাম ধাম জানতে পেরে রাজা তাকে অনেক যত্ন করে নিজের দরবারে নিয়ে আসেন। রাজা কাবুস জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা করতেন। তিনি জ্ঞানী ও পন্ডিতদের খুব পছন্দ করতেন।

রাজা কাবুস আল বেরুনীর জন্য ভাল থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এখানে দিনগুলো তার সুখেই কাটতে থাকে। কিন্তু তিনি তার তত্ত্বাবধায়ক বাদশাহের কথা কখনও ভুলতে পারেননি। রাজা কাবুসের কাছে থাকাকালে তিনি 'আসারুল বাকিয়া' ও 'তাজরী দু'শ শুয়াত' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ তিনি তার আমারুল বাকিয়া গ্রন্থটি রাজা কাবুসের নামে উৎসর্গ করেন।

খাওয়ারিজমের রাজা সুলতান মামুন বিন মাহমুদ জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধক ছিলেন। তিনি জ্ঞানী গুনীদের কদর করতেন। আল বেরুনীর কথা শুনে তাকে নিজের দরবারে পেতে চাইলেন। তার কাছে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি পাঠালেন। আল বেরুনী সুলতানের অনুরোধে ১০১১ খৃষ্টাব্দে মাতৃভূমি খাওয়ারিজমে ফিরে আসেন। সুলতান তাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে আল বেরুনী জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ও সাধনা চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি মান মন্দির প্রতিষ্ঠা করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ কাজ চালান। খাওয়ারিজমে তিনি ৫/৬ বছর পর্যন্ত ছিলেন। এ সময়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন।

www.icsbook.info

গজনীর সুলতান মাহমুদ জ্ঞানী ও পন্ডিতদের খুব সম্মান করতেন। তাঁর শাহী দরবারে প্রতিদিন দেশ বিদেশের জ্ঞানী ও গুনীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হত। সুলতান মামুনের রাজদরবারের জ্ঞানী ব্যক্তিদের গজনীতে পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়। পত্র পেয়ে আলবেরুনী গজনীতে সুলতান মাহমুদের শাহী দরবারে উপস্থিত হন। আল বেরুনী সুলতান মাহমুদের সঙ্গী হিসেবে ১০১৬ থেকে ১০১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গজনীতে ছিলেন। সুলতান মাহমুদ ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। আল বেরুনী সুলতান মাহমুদের সাথে কয়েকবার ভারতে আসেন। তিনি সে সময়কার ভারতের শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি দেখে অবাক হন। পরবর্তীতে তিনি ১০১৯ থেকে ১০২৯ পর্যন্ত মোট দশ বছর ভারতে থাকেন। এ সময় ভারতের জ্ঞানী গুণী ও পন্ডিতদের সাথে তিনি ভূগোল, গণিত ও ধর্মতত্ব সম্পর্কে মতের আদান প্রদান করেন। তিনি ভারতের জ্ঞান বিজ্ঞানের গ্রন্থ্ অধ্যয়ন করেন। ভারত থেকে ফিরেই তিনি রচনা করেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ্ 'কিতাবুল হিন্দ।' সে সময়ের ভারতীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য ও ধর্মীয় নিয়ম কানুন জানার জন্যে এটি একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ্।

বিখ্যাত পন্ডিত অধ্যাপক হামারনেহের আল বেরুনী সম্পর্কে বলেন, ভারতের জনগন ও সেদেশ সম্পর্কে আল বেরুনী গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। এর ফলে তিনি তাঁর কিতাবুল হিন্দ গ্রন্থে একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতের সভ্যতা সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য প্রদান করেন।

আল বেরুনী ভারত থেকে গজনীতে ফেরার কিছুদিন পরেই সুলতান মাহমুদ ইন্তেকাল করেন। তাঁর পুত্র মসউদ ১০৩১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। সুলতান মাসউদও আল

বেরুনীকে খুবই সম্মান করতেন। এ সময় আল বেরুনী 'কানুনে মাসউদী' নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটি তাঁর সেরা বই। সুবিশাল এই গ্রন্থে মোট ১১ টি খন্ড রয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ডে জোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে, তৃতীয় খন্ডে ত্রিকোনমিতি,চতুর্থখন্ডে আকৃতিক জ্যোতির্বিজ্ঞান, পঞ্চম খন্ডে গ্রহ, দ্রাঘিমা, চন্দ্রসূর্য্যের মাপ, ষষ্ঠ খন্ডে সূর্যের গতি, সপ্তম খন্ডে চন্দ্রের গতি অষ্টম খন্ডে চন্দ্রের দৃশ্যমান ও গ্রহণ, নবম খন্ডে স্থির নক্ষত্র, দশম খণ্ডে ৫টি গ্রহ নিয়ে এবং একাদশ খন্ডে জোতিষ বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়। গ্রন্থটি সুলতান মাসউদের নামে নামকরণ করায় তিনি খুশী হন ও বহু মূল্যবান রৌপ্যমুদ্রা উপহার দেন। আল বেরুনী সেসব রৌপ্য মুদ্রা রাজকোষে জমা দিয়ে দেন। কেননা তিনি তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন সম্পদ বা অর্থকড়ি কখনও নিজের কাজে জমা রাখতেন না। এমনই নির্লোভ ও ভালমানুষ ছিলেন আল বেরুনী।

আল বেরুনী বিভিন্ন বিষয়ে মানব জাতির জন্য অবদান রেখে গেছেন। তিনি তার বিভিন্ন গ্রন্থে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়, বিভিন্ন সভ্যতার ইতিহাস, মৃত্তিকাতত্ত্ব সাগর তত্ত্ব এবং আকাশ তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ইউরোপীয় পন্ডিতগণ আল বেরুনীর জ্ঞানের প্রশংসা করেছেন। তারা বলেন, আল বেরুনী নিজেই বিশ্বকোষ। এছাড়া তিনি একজন ভাষাবিদও ছিলেন। এক্ষেত্রেও তার খ্যাতি ছিল। তিনি আরবী, ফার্সী, সিরীয়, গ্রীক, সংস্কৃতি, হিব্রু, প্রভৃতি ভাষায় পন্ডিত ছিলেন। ত্রিকোনমিতিতে তিনি বহু তথ্য অবিস্কার করেন।

www.icsbook.info

কোপার্নিকাস বলেন, পৃথিবী সহ গ্রহগুলো সূর্য্যকে প্রদক্ষিন করে। অথচ কোপার্নিকাসের জন্মের ৪২৫ বছর আগ আল বেরুনী বলে গেছেন, পৃথিবী বৃত্তিক গতিতে ঘোরে। তিনি টলেমি ও ইয়াকুবের দশমিক অংকের গননায় ভুল ধরে দিয়ে তার সঠিক সমাধান দেন। তিনিই সর্বপ্রথম অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেন। তিনিই প্রথম প্রাকৃতিক ঝর্না ও আর্টেজিয় কূপের রহস্য উদঘাটন করেন। তিনি একজন খ্যাতনামা জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি যেসব ভবিষ্যদ্বানী করতেন সেগুলো সঠিক হত। তিনি শব্দের গতির সাথে আলোর গতির পার্থক্য নির্ণয় করেন। তিনি এরিষ্টটলের 'হেভেন' গ্রন্থের ১০টি ভুল বের করেন। ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্কটিও তিনি আবিস্কার করেন।

আল বেরুনী সুক্ষ ও শুদ্ধ গণনার একটি বিস্ময়কর পন্থা আবিস্কার করেন। তার বর্তমান নাম দি ফরমুলা অব হিন্টার পোলেশন। পাশ্চাত্যের পন্ডিতরা এটাকে নিউটনের আবিস্কার বলে প্রচার করছেন। অথচ তার ৫৯২ বছর আগেই আল বেরুনী এটি আবিস্কার করেন। একে ব্যবহার করে তিনি বিশুদ্ধ সাইন তালিকা তৈরী করেন। এ ফর্মুলা পূর্ণতাদান করে তিনি একটি ট্যানজেন্ট তালিকাও তৈরী করেন। বিভিন্ন প্রকার ফুলের পাপড়ি সংখ্যা হয় ৩,৪,৫,৬ এবং ১৮ হবে কিন্তু কখনো ৭ বা ৯ হবে না। তিনিই প্রথম এ সত্য আবিস্কার করেন।

আল বেরুনী চিকিৎসা বিজ্ঞানে একটি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি বহু রোগের ঔষুধ তৈরীর কলাকৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা ১১৪। তিনি বিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ও ইতিহাস বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম হচ্ছে 'কিতাবুল তাফহিম। এটি ৫৩০ অধ্যায়ে বিভক্ত। এতে অংক, জ্যামিতি ও বিশ্বের গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তার ইফরাদুল ফাল ফিল আমরিল আযলা' গ্রন্থে জ্যোতির্বিজ্ঞানের ছায়াপথ সম্পর্কে

www.icsbook.info

আলোচনা করা হয়েছে। তিনি 'আল আসরুল বাকিয়া' আলাল কুবানিল কালিয়া' গ্রন্থে পৃথিবীর প্রাচীন কালের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। যিজে আববন্দ (নভোমন্ডল) ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত। আলাল ফি যিজে খাওয়ারিজমি (যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে) তাঁর আরও দু'টি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

আল বেরুনী সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদের মধ্যে শীর্যস্থানীয় এক মহাপন্ডিত। তাঁর ও অন্যান্য মুসলিম বিজ্ঞানী ও জ্ঞান সাধকদের মৌলিক আবিস্কারের উপরই গড়ে ওঠেছে আজকের আধুনিক বিজ্ঞান। তাদের অবদানকে অস্বীকার করা অকৃতজ্ঞতার পরিচয়। বরং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের অবদানকে স্বীকার করে নেয়াই হবে সঠিক ও যুক্তিসম্মত কাজ।

আল বেরুনী এত বড় পন্ডিত হওয়ার পরেও ছিলেন একজন সৎ ও ভাল লোক। তিনি খুবই ধার্মিক ছিলেন। তার মনে কোন গৌরব বা অহংকার ছিল না। তিনি সঠিকভাবে নামাজ রোজা করতেন এবং ইসলামের সকল হুকুম আহকাম মেনে চলতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, তাঁর অর্জিত জ্ঞান খুবই সামান্য। সকল জ্ঞানের উৎস হলেন আল্লাহ। তিনি ৬৩ বছর বয়সে কঠিন অসুখে পড়েন। বহু চিকিৎসার পরেও তিনি আর সুস্থ হতে পারেননি। অবশেষে ৭৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। এটি ছিল ১০৪৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর রোজ শুক্রবার।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জর্জ সার্টন বলেছেন, আল বেরুনী সকল যুগের ও সকল দেশের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের অন্যতম। সভ্যতার ইতিহাসে তাঁর যে বিরাট অবদান রয়েছে, কোনদিন তা' মুছে যাবার নয়।

✪✪✪

www.icsbook.info

ইমাম খোমেনী

ইরানের একটি সুন্দর শহর। নাম তার খোমেইন। এটি সেদেশের রাজধানী তেহরান থেকে সোয়া দু'শত কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এই শহরেই জন্ম হয় আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ আল মুসাভী আলী খোমেনীর। সেদিন ছিল ১৯০১ সালের ২৩শে অক্টোবর। তাঁর পিতার নাম আয়াতুল্লাহ সাইয়েদ মোস্তফা মুসাভী। আর মাতার নাম হাজেরা। পিতা বড় আলেম ছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে জনগনকে দিক নির্দেশনা দিতেন। সাইয়েদ মোস্তফার ছিল ৩ পুত্র কন্যা। ইমাম খোমেনী ছিলেন সকলের ছোট।

তিনি খুবই বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছিলেন। ছাত্র হিসেবে তিনি সাফল্যের পরিচয় দেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং ধর্মতত্ত্বে তিনি পান্ডিত্য অর্জন করেন। পরে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। ২৭ বছর বয়সেই তিনি এসব মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করতে সক্ষম হন।

৪০ বছর বয়স মানুষের জীবনে পূর্ণতার সূচনা করে। আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াতি লাভ করেন। ইমাম খোমেনীও তার ৪০ বছর বয়স হওয়ার পর থেকে তার দেশের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রের ঘটনাবলী গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করা শুরু করেন। সেটা ছিল ১৯৪১ সালের কথা। এ সময় থেকে তিনি ইরানে ইসলামী বিপ্লব ঘটানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

রেজা শাহ নামে একজন ইরানী সৈনিক ইরারের ক্ষমতা দখল করে নেন। তিনি হঠাৎ করে আড়াই হাজার বছর আগের

www.icsbook.info

রাজবংশের সদস্য বলে নিজেকে দাবী করেন। যুক্তরাষ্ট্র তাকে সবরকম সহায়তা দিত। তিনি এর বিনিময়ে তেল সহ দেশের সম্পদের নিয়ন্ত্রন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে দেন। শাহের রাজতন্ত্র পুরাপুরিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। তারাই সবকিছু নিয়ন্ত্রন করতো। শাহ পুতুলের মত তাদের কথায় উটাবসা করতেন। শাহ ইরানে পাপাচারের বিস্তৃতি ঘটান। এটাকে তিনি নিজের দায়িত্ব বলে মনে করতেন। সারাদেশে মদের ব্যাপক প্রচলন করা হয়। প্রগতির নামে নারীদের খোলামেলা করা হয়। ব্যভিচারকে সমাজে ব্যাপকভাবে চালু করা হয়। আলেমরা এসব অন্যায় কাজের বিরোধীতা করতেন। তাদের উপর ইরানের শাহের গুপ্ত পুলিশ সাভাক নজর রাখতো। আলেমদের অনেককে কারাগারে নিক্ষেপ করা হত। রেজা শাহ্ তাঁর দেশকে ধ্বংসের মুখে দাঁড় করিয়ে রাখেন। রাজবংশের শাসনের নামে ইরানের জনগণকে শোষণ করে রেজাশাহ ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে। সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করতে থাকে। জনতার উপর জোর জুলুম আর অত্যাচার চালাতে থাকে। সে সময় মানুষের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার ছিল না। সংবাদপত্রগুলো স্বাধীন ছিল না। সাভালোক নামের গুপ্ত পুলিশ বাহিনী জনতার উপর খবরদারি করতো। কেউ শাহের বিরুদ্ধে কথা বললে তাকে ঠান্ডামাথায় হত্যা করা হতো। অনেকের উপর চরম নির্যাতন চালানো হত। এর ফলে তারা চিরকালের জন্য পুঙ্গু হয়ে পড়তেন।

এ সময় দেশে পাশ্চাত্যের ধানধারণা চালু করা হয়। অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, মদ আর জুয়াতে দেশ ভাসতে থাকে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে মদের দোকান আর নাইট ক্লাব গজিয়ে ওঠে। ইরানের অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রন করতো যুক্তরাষ্ট্র। বৃটেনও এতে সহায়তা দিত। সাভাক এর প্রশিক্ষণ হত ইসরাইলে।

www.icsbook.info

ইরানের তেল সম্পদের বিরাট লভ্যাংশ বৃটেন ও আমেরিকার তেল কোম্পানীর হাতে ছিল। বহু জাতিক সংস্থাগুলো সম্পদ লূণ্ঠন করছিল দেদারসে শাহ ছিলেন পাশ্চত্যের অনুগত ভৃত্য। বৃটিশদের একচেটিয়া তামাক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ইরানী জনগন সেদেশের রাজবংশের বিরুদ্ধে প্রথমবারের মত আন্দোলন করে। এর নেতৃত্ব আলেম সমাজই দেন। মুজতাহিদ মীর্জা হাসান সিরাজী তামাক বর্জনের ডাক দেন। এটা এত সুদূর প্রসারি হয় যে রাজবংশের মহিলারা পর্যন্ত তামাক বর্জন করেন। ১৮৯২ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল। এ সময় সাম্রাজ্যবাদ ও রাজতন্ত্র বিরোধী আন্দোলনেরও আলেমরাই নেতৃত্ব দেন। নেতৃস্থানীয় আলেমদের মধ্যে ছিলেন, মীর্জাহাসান সিরাজী, মুজতাহিদ সাইয়েদ মুহাম্মদ বিহবাহানী, সাইয়েদ তাবাতবাঈ, শেখ ফয়জুল্লাহনূরী, আয়াতুল্লাহ কাশানী, আয়াতুল্লাহ বুরুজারদী।

১৯০৬ সালে আলেমরা কোরআন ভিত্তিক সংবিধান প্রবর্তনের দাবী জানান। এ আন্দোলনকে দমনের জন্য শাহ নেতৃস্থানীয় কয়েকজন আলেমকে ফাঁসি দেন বৃটিশের সহায়তায় শাহ সে সময় চরম স্বৈরাচারী শাসন চালান। ১৯৫২-৫৩ সালে তেল শিল্প জাতীয় করনের সময় বৃটিশরা পুণরায় আলেম সমাজের প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। ১৯৫৩ সালে ডক্টর মোসাদ্দেকের মন্ত্রী সভার পতন হয়। এরপর শাহের বিরুদ্ধে আলেমরা আরো জোরদার ভূমিকা গ্রহণ করে। আয়াতুল্লাহ কাশানী এ সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আলেমদের আন্দোলনে ১৯৪১ সালে রেজা শাহ ক্ষমতাচ্যুত হন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সি আই এ-র সহায়তায় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে এবং এর মাধ্যমে ১৯৫৩ সালে রেজা শাহ আবার সিংহাসন বসে।

www.icsbook.info

১৯৬২ সালে ইরানের মন্ত্রিসভা প্রাদেশিক ও নগর কাউন্সিল সংক্রান্ত একটি বিল অনুমোদন করে। এতে ইসলাম সম্পর্কিত বিধানটি বাদ দেওয়া হয়। নয়া প্রস্তাবে বলা হয়, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য পবিত্র কোরআন নিয়ে শপথ করাটা বাধ্যতামূলক নয়। তারা যেকোন ধর্মগ্রন্থ নিয়ে শপথ করতে পারবেন। ইমাম খোমেনী এই বিলের বিরোধীতা করেন। জনতার তীব্র আন্দোলনে বিলটি বাতিল করা হয়। রেজা শাহ্ তার ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য শাহ্ ও জনতার বিপ্লব নামে তথাকথিত সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এজন্য ১৯৬৩ সালের ২৬ জানুয়ারী ইরানে গণভোট ডাকা হয়। ইমাম খোমেনী গণভোট বর্জনের ডাক দেন। জনগন ইমাম খোমেনীর ডাকে সাড়া দেয়। ভোট কেন্দ্রে শাহের গুপ্ত পুলিশ সাভাক ও তার অল্প সংখ্যাক অনুচরই কেবলমাত্র ভোট দেয়। ১৯৬৩ সালের কোমের আলেমরা সে বছরের সপ্তাহব্যাপী নববর্ষ (নওরোজ উৎসব পালন বর্জনের ডাক দেন। কোম হচ্ছে ইরানের নেতৃস্থানীয় আলেমদের কেন্দ্রস্থল। জনগণ আলেমদের ডাক সাড়া দিল। কেননা নববর্ষের দ্বিতীয় দিনেই ছিল হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ)এর শাহাদাত বার্ষিকী। ইমাম খোমেনীর প্রতি জনগনের সমর্থন দেখে শাহ্ গণহত্যার পথ বেছে নিলেন।

১৯৬৩ সালের ২২মার্চ, ইরানী নববর্ষের দ্বিতীয় দিন। কোমের মাদ্রাসা ফারজিয়ায় ইমাম জাফর সাদেকের শাহাদত দিবস উপলক্ষ্যে এক শোক সভার আয়োজন করা হয়। শাহের বাহিনী ঐ সভায় হামলা চালায়। এর প্রতিবাদ করে ইমাম খোমেনী বিবৃতি দেন। পরে ৫জুন মাদ্রাসা ফাজিয়ায় অপর এক সমাবেশে ভাষণ দেন। শাহ্ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠলেন। সে রাতে কোম নগরী ঘেরাও করা হয়। সৈন্যরা ইমাম খোমেনীর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করলো।

www.icsbook.info

ইমামের গ্রেফতারের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সারাদেশের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। পরদিন সকালে ইমাম খোমেনীর পুত্র মোস্তফা খোমেনীর নেতৃত্বে কোমের পথে নেমে এল বিশাল মিছিল। শ্লোগান ওঠলো, হয় খোমেনী না হয় মৃত্যু। তেহরানেও বিশাল মিছিল বের হল। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ও বাজারের দোকান পাট বন্ধ হয়ে গেল। সারাদেশে জনতার বিক্ষোভে শাহের মসনদ নড়বড়ে হয়ে ওঠে। এতে ভীত হয়ে শাহ ইরানে সামরিক আইন জারী করেন। কিন্তু তাতেও কাজে হয় না। জনতা বিন্দুমাত্র ভীত হল না। সরকারের ক্ষমতার প্রতিবৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দেশের অগনিত মানুষ তাদের ইমামের মুক্তির জন্য রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতেলাগলো। গোটাদেশ যেন জেগে উঠেছে। চারদিকে শুধু শ্লোগান আর শ্লোগান। ইরানের নগরে বন্দরে ও প্রতিটি জনপদে সফল হরতাল পালিত হল। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য শাহের সৈন্যরা নিরস্ত্র জনতার উপর কাপুরুষের মত হামলা চালায়। শুরু হয় পাইকারী গনহত্যা। তেহরানে ১৫ হাজার এবং কোম শহরে সৈন্যদের গুলীতে ৪শ' লোক শহীদ হলেন। ফারজিয়ায় নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের প্রথম বার্ষিকী ঘনিয়ে এল। শাহের সৈন্যরা কোম শহর ঘেরাও করে। জনগনের তীব্র আন্দোলনে শাহ বাধ্য হয়ে ইমামকে মুক্তি দিলেন। ফিরে এলেন তিনি নিজ শহর কোমে।

সে সময় শাহের মনোনীত প্রধানমন্ত্রী মনসুরের পুতুল সরকার ইরানী পার্লামেন্টে ক্যাপিটিউশেন বিল পাশ করে। ইরানে মার্কিন নাগরিকদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে এই বিলটি পাশ করা হয়। ইমাম এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। আন্দোলনকে দমিয়ে দিতে শাহ ইমামকে দেশের বাইরে নির্বাসনে পাঠানোর পরিকল্পনা করলেন।

১৯৬৪ সালের ৪ নভেম্বর। শাহের সৈন্যরা কোম শহর ঘেরাও করে। ইমাম খোমেনীকে আবার গ্রেফতার করা হয়। ইমামকে মেহরাবাদ বিমান বন্দরে নিয়ে সেখান থেকে তুরস্কের ইজমিরে নির্বাসনে পাঠানো হল। ১৯৬৫ সালের অক্টোবরে ইমামকে তুরস্ক থেকে ইরাকের নাজাফে পাঠানো হল। শাহের অনুরোধে ইরাকের বাথ সরকার ইমাম খোমেনীকে নানাভাবে হয়রানি করতে থাকে। সেখানে থেকে তাকে প্যারিসে পাঠানো হয়। নির্বাসিত থেকেও ইমাম ইরানের জনগনের কাছে বক্তৃতা ও বানী পাঠান। যা ক্যাসেটে বাজানো হত।

১৯৭৮ সালের ৯ মহররম ইরানে গনঅভ্যূত্থান ঘটে। এদিন লাখ লাখ লোক তেহরানের রাজপথে নেমে আসে। অন্যান্য শহরেও মুক্তিকামী জনতা মেশিনগান সজ্জিত সৈন্যদের সামনে ছুটে যেতে থাকে। মানুষ শহীদ হওয়ার জন্য কাফনের কাপড়ও পরিধান করে। মেশিনগানের গুলীতে একের পর এক মানুষ শহীদ হতে থাকে। শুধুমাত্র কালো শুক্রবারেই (১৯৭৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর) প্রায় ৫ হাজার লোক শহীদ হয়। ১৯৭৮ সালের ৪ নভেম্বর তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ইমাম খোমেনীকে ইরানে ফিরিয়ে আনার দাবীতে মিছিল বের করে। সৈন্যদের গুলী করার নির্দেশ দেয়া হয়। তাদের গুলীতে ৬৫ জন ছাত্র শহীদ হন।

এরপর মহররমের ৯ এবং ২০ তারিখে আবার বিক্ষোভ হয়। ইমাম খোমেনী প্যারিস থেকে আশুরার বানী পাঠান। তাতে মহররমকে তরবারির উপর রক্তের বিজয় বলে ঘোষণা করা হয়। শাহের নিয়োজিত সামরিক প্রধান জেনারেল আজহারী ঘোষণা দিলেন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দু'দিন কার্ফু থাকবে। এসময় মসজিদেও কোন অনুষ্ঠান করা যাবে না। রাস্তায় কেউ এমাকি বের হতে পারবেনা। জনতা

সামরিক শাসন অগ্রাহ্য করলো। তেহরানের রাজপথে ৫০/৬০ লাখ লোক জমায়েত হল। তারা বিক্ষোভ মিছিল সহকারে উত্তরাঞ্চলের দিকে এগোতে থাকে।

শাহ ও তার বিদেশী উপদেষ্টারা বুঝতে পারলো এখন আর জনতাকে ঠেকানো যাবে না। তাই ইসলামী জনতার উত্থানকে ঠেকানোর জন্য জেনারেল আহজারির সরকারকে বাতিল করে কট্টর ধর্মবিরোধী শাপুর বখতিয়ারকে নিয়োগ করে। বখতিয়ার শাহের দেশত্যাগের ব্যবস্থা করেন। ১৯৭৯ সালের ১৬ জানুয়ারী শাহ দেশ ত্যাগ করেন। বখতিয়ার সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়। জনতা খোমেনীকে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবী জানাতে থাকে। বখতিয়ার সে দাবী মানতে চাচ্ছিলনা। শেষে বখতিয়ারের অনুমতি ছাড়াই ইমাম খোমেনী দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন। বিমান বন্দরে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র হল। ইমামের অনুগত বিমান বাহিনীর সদস্যরা ইমামকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। কিন্তু ইমাম নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট ফ্লাইটে দেশে ফেরার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন।

শাপুর বখতিয়ার তেহরান বিমান বন্দর বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। কিন্তু বিমান বন্দরের বর্মচারীরা তা মানলেন না। তারা ইমামের বিমানকে নির্বিঘ্নে ইরানে নামার সুযোগ দিলেন। ইমাম এবার বিজয়ীর বেশে দেশে ফিরলেন।

সেটা ছিল ১৯৭৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী। এদিন ইমাম খোমেনী দেশে ফেরেন। ৬০ লাখ লোক তাকে বিমান বন্দরে সম্বর্ধনা জানায়। দেশে ফেরার এক সপ্তাহ পর তিনি মেহেদী বাজারগনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। বাজারগণ অস্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ইমাম খোমেনী এসময় একটি বিপ্লবী পরিষদও গঠন করেন। এদিকে বখতিয়ার সরকারও ক্ষমতা ছাড়েনি। ফলে একই সাথে দু'টি সরকার অস্তিত্ব লাভ করলো। কিন্তু জনগনের উপর বখতিয়ার সরকারের কোন

নিয়ন্ত্রন ছিল না। তবুও তিনি সেনাবাহিনীর সাহায্যে টিকে থাকতে চাইলেন। ১০ ফেব্রুয়ারী ইমাম সামরিক আইনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ না করতে বললেন। ইমামের সমর্থনে সেনাবাহিনী থেকে দলত্যাগ শুরু হয়। সৈন্যরা যাতে জনগনের বিরুদ্ধে না যায় সেজন্য ইমাম তাদের প্রতি আহবান জানান।

তেহরানের বিমান বাহিনীর ক্যাডেটরা মিছিল করে ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে ইসলামী সরকার গঠনের দাবী জানায়। অফিসাররা ব্যারাকে ফেরার জন্য চাপ দিলেও তারা কর্নপাত না করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। গ্যারিসনের কম্যান্ডারদের রাজকীয় বাহিনীর সদর দফতরে ডাকা হয় বিদ্রোহ দমনের জন্য। বেশ কিছু ট্যাংক বিমান বাহিনীর গ্যারিসনে সদর দফতরে ডাকা হয় বিদ্রোহ দমনের জন্য। বেশ কিছু ট্যাংক বিমান বাহিনীর গ্যারিসনে পৌছায়। ইমাম জনগনকে সামরিক আইন উপেক্ষা করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ার ডাক দেন। জনতা গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহে হামলা চালাতে থাকে। প্রধানমন্ত্রীর অফিস রেডিও, টিভি, পার্লামেন্ট ভবন, সাভাক কেন্দ্রীয় দফতর ও অন্যান্য শাখা অফিস ও নির্যাতন কেন্দ্রে গোলযোগ ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এদিন আরো ৭/৮ শ' লোক নিহত হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হওয়ায় শাপুর বখতিয়ার রাতের আঁধারে পালিয়ে যান। ফলে শাহ ও তার অনুচরদের পতন হয়। ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯। ইরানে ইসলামী বিপ্লব সফল হল।

ইমাম খোমেনী ছিলেন পাশ্চাত্যের আতংক। সালমান রুশদী ইসলাম বিরোধী গ্রন্থ রচনা করলে ইমাম তার মৃত্যুদন্ড ঘোষণা করেন। ইমাম নিজে সরকার পরিচালনা না করলেও সরকারকে দিক নির্দেশনা দিতেন। তিনি ১৯৮৯ সালের ৩ রা জুন রাত দশটা ২০ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। তিনি সরকারী ক্ষমতা গ্রহণ না করেও তার দেশ ও বিশ্বের লক্ষ কোটি নির্যাতিত মানুষের একান্ত আপন জনে পরিনত হন।

✪✪✪

www.icsbook.info

আয়াতুল্লাহ্ সাইয়েদ আলী খামেনেয়ী

ইরানের একটি প্রদেশের নাম খোরাসান। খোরাসানের রাজধানী মাশহাদ। সেখানে এক ধর্মীয় পরিবারে জন্ম হল একটি শিশুর। সেটি ১৯৩৯ সালের ১৫ জুলাই। এই শিশুই পরবর্তীকালে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হন। ইমাম খোমেনীর ইন্তেকালের পর বর্তমান ইরানের তিনিই রাহবার। তিনি অধ্যাত্মিক নেতা। সেদেশের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তিনি দিক নির্দেশনা দান করেন।

মাশহাদে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি পবিত্র কোম শহরে যান। সেখানে পড়াশুনা করার সময় তিনি ইমাম খোমেনীর ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসেন। ১৯৬২ সালে তিনি ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে পরিচালিত ইসলামী আন্দোলনে যোগদান করেন। ইমাম খোমেনী সে সময় কোরআনের অবমানামূলক একটি বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিলেন। আন্দোলনের প্রচন্ডতায় সরকার ইমাম খোমেনীকে গ্রেফতার করে। একই সাথে আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীও গ্রেফতার হন। ইমাম খোমেনী এবং তাঁর একান্তই বিশ্বস্ত সহকর্মী আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে সারা ইরানে প্রচন্ড বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৯৭৬ সালের ৫ জুন শুধুমাত্র তেহরানেই ১৫ হাজার লোক শহীদ হন। শাহ ইমাম খামেনেয়ীকে বিদেশে নির্বাসনে পাঠালে আয়াতুল্লাহ খামানেয়ী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। ১৯৭৮ সালে তিনি মাশহাদে ফিরে আসেন এবং ইসলামী বিপ্লবের নেতৃত্ব দেন। ১৯৭৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী ইসলামী বিপ্লব শুরু হয়। বিপ্লবের পরপরেই ১৯৭৯ সালের মার্চে

www.icsbook.info

আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী বিপ্লবী পরিষদের একজন সদস্য মনোনীত হন।

১৯৭৯ সালের আগষ্টে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের উপ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হন। ডিসেম্বরে তিনি বিপ্লবী রক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক হন। ১৯৮০ সালের ১৯ জানুয়ারী ইমাম খোমেনী তাকে তেহরান নগরীর জুময়ার নামাজের ইমাম নিযুক্ত করেন। ১১ মার্চ তিনি প্রতিরক্ষা পরিষদের উপদেষ্টা হন। এর আাগে ৫ই মার্চ পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হন।

ইরাকের সাথে যুদ্ধ শুরু হলে ইমাম খোমেনী তাকে দক্ষিনাঞ্চলের রনাঙ্গনে পাঠান। আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী ১৯৮০ সালের ১লা অক্টোবরের নির্বাচনে ৯৫ শতাংশ ভোট পেয়ে ইরানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি সরকার পরিচালনাতেও যোগ্যতার প্রমান দেন। ১৯৮৫ সালের ২০ আগষ্ট পুনরায় তিনি ইরানের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বচিত হন।

আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী ফার্সী ছাড়াও আরবী, তুর্কী প্রভৃতি ভাষায় সুপন্ডিত। তিনি ইসলামী আদর্শ ও ইতিহাসের উপর অনেকগুলো মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তার গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে "আয়েন্দেহ সুলহে ইমাম হাসান।" ইমাম খামেনেয়ীর ইন্তেকালের পর আয়াতুল্লাহ খামেনেয়ী ১৯৮৯ সালের ৪ঠা জুন ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের নতুন অধ্যাত্মিক নেতা নির্বাচিত হন।

✪✪✪

www.icsbook.info

মহাকবি নিজামী

তাঁর নাম নিজামী। পুরা নাম আল ইলিয়াছ ইউসুফ আবুবকর নিজামুদ্দীন নিজামী। হিজরী ৫৩৩ সনে তিনি ইরানের কুমে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুঈদ। নিজামী পন্ডিত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ভাই বিখ্যাত কবি ছিলেন। নিজামী প্রথমে বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ করেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই কবিতা রচনা করতেন। শিক্ষা অর্জনের পর তিনি কাব্য সাধনায় মন ঢেলে দেন। এসময় তার কবিতার সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর সুখ্যাতি শুনে সে যুগের সম্রাটরা তাঁর প্রতি যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাতেন। সকল সম্রাট তাদের দরবারে তাকে ডেকে নিয়ে বহু তাঁর কবিতা শুনতেন।

নিজামী সৎ ছিলেন। তিনি সততা পছন্দ করতেন। অসৎ লোকদের দেখতে পারতেন না। বাহ্রাম শাহ্ কবি নিজামীকে পছন্দ করতেন। কবি মখজনই আসরার কাব্য গ্রন্থ রচনা করে হিজরী ৫৫৯ সালে তাঁর নামে উৎসর্গ করেন। বাহারাম শাহ এতে খুশী হন। এবং কবিকে ৫ হাজার স্বর্ণমুদ্রা, অনেকগুলো উট এবং বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ উপহার দেন। মখজন রচনার সময় কবির বয়স ছিল ২৫ বছর।

নিজামীর জন্মভূমি গঞ্জ সেলজুক বাদশাহদের রাজত্বের সীমায় অবস্থিত ছিল। এ সময় এই বংশের সুলতান তুগরল বিন আরসান রাজত্ব করতেন। তিনি সাহসী, ন্যায় বিচারক ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজেও কবিতা রচনা করতেন এবং কবিদের সমাদর করতেন।

www.icsbook.info

নিজামী সে সময় শিরীন ও খসরু রচনা শুরু করেছেন। এর সুনাম বহু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। তুগরলও জানতে পারলেন নিজামীর কাব্য রচনার কথা। তিনি কবির কাব্যের সাথে তাঁর নাম জড়িত করার অনুরোধ জানান।

নিজামী যখন এই মসনভী রচনা করছিলেন তখন তার এক বন্ধু তার সাথে দেখা করতে এলেন। তিনি কবিকে শিরীন খসরু রচনা করতে দেখে অসন্তুষ্ট হলেন এবং বললেন, মিথ্যা কাহিনী রচনা করে কি লাভ? নিজামী বন্ধুর মন্তব্যের কোন জবাব না দিয়ে তার কাব্যখানা পড়তে শুরু করলেন। কাব্যের অপরূপ সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে তার বন্ধু মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এরপর শিরীন খসরু কাব্যের ব্যাপারে তিনি আর কোন কথা বলতে পারলেন না।

কবির শিরীন-খসরু কাব্য লেখা সমাপ্ত হয়েছে জানতে পেরে সম্রাট ফজল আরসালান তাঁকে রাজদরবারে আসার আহবান জানান। পত্রবাহক রাজকীয় আমন্ত্রনপত্র নিয়ে নিজামীর কাছে পৌঁছলেন। রাজার আদেশ তিনি মাথার উপর রাখলেন। সম্মানের সাথে চুমু খেয়ে তখনই ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে রওয়ানা হলেন। তখনকার দিনে সুপ্রশস্থ রাস্তাঘাট ছিল না। এখনকার মত যানবাহনও ছিলনা। কবি দিনের পর দিন ঘোড়ায় চড়ে প্রান্তর ও বন অতিক্রম করতে থাকেন। একমাস পর তিনি সম্রাটের রাজধানীতে পৌঁছলেন। রাজদূত গিয়ে কবি নিজামীর আগমনের বার্তা ঘোষণা করলেন। সম্রাটের নির্দেশে তাঁর মন্ত্রী শামসুদ্দিন মাহমুদ কবিকে সঙ্গে করে রাজদরবারে

www.icsbook.info

নিয়ে আসেন। নিজামী যখন রাজদরবারে পৌঁছলেন সে সময় আনন্দ মজলিস বসেছে। প্রাসাদ সুন্দরভাবে সুসজ্জিত এবং গান বাজনা চলছিল। সম্রাট ফজল আরসালান কবি নিজামীর সম্মানার্থে গানবাজনা বন্ধ করে দিলেন। সিংহাসন থেকে উঠে নিজামীকে সসম্মানে উপযুক্ত স্থানে বসালেন। তাদের মধ্যে নানান বিষয়ে আলোচনা হল। কবি কবিতা পাঠ করতে চাইলেন। সে যুগে নিয়ম ছিল রাজদরবারে কবি নিজের কবিতা পাঠ করতেন না। বরং কবির সঙ্গে একজন লোক থাকতেন তিনি তা পাঠ করতেন। তাকে রাবী বলা হত। যতক্ষন রাবী কবিতা পড়তেন ততক্ষণ কবিকে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। নিজামীও দাঁড়িয়ে থাকতে চাইলেন। কিন্তু ফজল আরসালান তাঁকে দাঁড়াতে নিষেধ করলেন।

রাবী যখন খসরু-শিরী শুরু করলেন তখন সম্রাট কবির কাঁধে হাত রেখে বিশেষ আগ্রহভরে তা' শুনতে লাগলেন। রাজসভার সকলেই মহাখুশী হলেন। বাদশাহ নিজামীর দিকে লক্ষ্য করে বললেন, চিরকালের জন্য আপনি আমার নাম বিখ্যাত করেদিলেন। এর মূল্য দেয়া আমার জন্য অবশ্য কর্তব্য। তিনি আরো বলেন, তাঁর ভাই কবিকে জায়গির হিসেবে যে দু'খানা গ্রাম দিয়েছেন তা' তিনি পেয়েছেন কিনা? কবি হ্যাঁ সূচক জবাব দেন।

নিজামীর সুখ্যাতি শুনে প্রত্যেক রাজা বাদশাহই তার নাম অমর করে রাখার জন্য কবিকে দিয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়ে নিতে আগ্রহী হন। এদের মধ্যে বাদশাহ মুনচেহর নিজ হাতে ১০/১৫ ছত্রের একটি পত্র

নিজামীকে লিখে তাকে লায়লী মজনুর কাহিনী নিয়ে কাব্য রচনা করতে বললেন। তাঁর পত্র পেয়ে নিজামী চিন্তিত হয়ে পড়েন। এ সময় কবি ১৪ বছরের কিশোর পুত্র সেখানে উপস্থিত ছিল। কবি তাকে বললেন, এই লায়লী মজনুর কাহিনী কাব্য রচনার উপযুক্ত নয়। কেননা এটা একেবারেই দুঃখের কাহিনী। এটা কি করে উপভোগ্য রচনা করা যাবে -এ বিষয়ে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন। পুত্র বলেন—ইতোপূর্বে আর কেউ এই কাহিনী কাব্য আকারে রচনা করেন নাই। কাজেই উহা রচনার জন্য তিনি পিতাকে অনুরোধ জানান। রাজকীয় আদেশ অনুযায়ী কবি ৪ মাসের মধ্যে লায়লী-মজনু রচনা শেষ করেন।

নিজামীর এই কাব্য রচনার পুরস্কার হিসেবে সম্রাট কবি পুত্রকে রাজপুত্রের মত শিক্ষা-দীক্ষা ও যাবতীয় প্রশিক্ষণ গ্রহণের খরচ বহন করেন।

৫৯৩ হিজরীর ১৪ রমজান কবি সুলতান গিয়াসুদ্দীনের নির্দেশে পয়বার নামক কাব্য রচনা করেন।

ফজল আরসালানের মৃত্যুর পর তাঁর ভাতিজা আবু বকর নাসিরুদ্দিন ৫৮৩ হিজরীতে সিংহাসনে বসেন। নেজামী বহুকাল বাদশাহদের ফরমায়েশ মোতাবেক কাব্য রচনা করেন। একবার তিনি নিজের ইচ্ছানুযায়ী সেকেন্দর নামা রচনা করেন। এতে নাসীরুদ্দিনের নামের উল্লেখ রয়েছে। এই কাব্য ৫৯৯ হিজরীতে শেষ হয়। এই কাব্য রচনা করে তিনি রাজার কাছে উপহার পাঠান। সম্রাট তাকে মূল্যবান ঘোড়া ও কাপড়চোপড় প্রদান করেন। নিজামীর পুত্রের সাথে এক সম্রাটের

www.icsbook.info

মেয়ের বিয়ে পর্যন্ত সম্পন্ন হয়। সেকান্দর নামা কাব্যে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে। এটি রচনার সময় তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর।

এই গ্রন্থ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর বছর ছিল ৫৯৯ হিজরী।

তিনি সারা জীবন তাঁর নিজের ঘরেই কাটয়েছেন। বেশী লোকের সাথে তিনি দেখা সাক্ষাৎ করতেন না। জীবনী কাররা তাঁর একটি বিশেষ গুণের প্রশংসা করে থাকেন। সেটা হচ্ছে তিনি রাজা বাদশাদের তোষামদ করা পছন্দ করতেন না। তারপরেও রাজা বাদশাহরাই তার সাথে বিশেষ আগ্রহের সাথে মিশতে চাইতেন এবং তাঁর কাছে আসতেন। তাঁকে প্রচুর পুরস্কার দিয়ে রাজাবাদশাহরা সেজন্য গৌরববোধ করতেন।

নিজামী অসাধারণ কবি ছিলেন। ইরানে তাঁকে সাধারণত হেকিম নিজামী গঞ্জভী বলা হয়। নেজামী সারাজীবন তাঁর মাতৃভূমি গঞ্জে থাকতেন। তিনি খুব কমই বাইরে ভ্রমনে যেতেন। তিনি ঘরকুনো ধরণের লোক ছিলেন। কবি সারা জীবনে একবার মাত্র ঘর ছেড়ে বাদশাহ আরসালা সেলজুকীর আমন্ত্রনে তার দরবারে গিয়েছিলেন।

নিজামী তিনটি বিয়ে করেন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম আফাক। বাদশাহ আরসালান যে উপহার সামগ্রী পাঠিয়েছিলেন -তার মধ্যে অপূর্ব সুন্দরী এক তরুনী ছিল। তার নাম আফাক। কবি তাকে বিয়ে করেন। স্ত্রীর প্রেমে মশগুল থাকাকালে নিজামী শিরীন খসরু কাব্য রচনা করেন। এই কাব্য রচনা শেষ হওয়ার পর

আফাক ইন্তেকাল করেন। তাঁর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্ত্রীর নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

কবির ছেলেদের মধ্যে মুহাম্মদ নামে তার এক পুত্রের কথা জানা যায়। শিরীন খসরু রচনাকালে তার বয়স ছিল ১৪ বছর। তাঁর এ পুত্রের হাত দিয়ে সম্রাটের কাছে 'শিরীন খসরু' কাব্যগ্রন্থ পাঠান। তাঁর ইকবাল নামায় এ বিষয়ের উল্লেখ দেখা যায়। নেজামী ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তার কবর পাকা করে তার উপর গম্বুজ তৈয়ার করা হয়।

নিজামী ২০ হাজার ছত্র কবিতা রচনা করেন। তিনি মহৎ স্বভাবের কবি ছিলেন। তিনি বাদশাহ এবং আমির ওমরাদের সাথে থাকতে পছন্দ করতেন না। সমগ্র জীবন তিনি ঘরের কোনে কাটিয়েছেন। নতুন গঞ্জ শহর থেকে এক মাইল দূরে তাঁর কবর রয়েছে।

✪✪✪

www.icsbook.info

মোহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল রাযী

মুসলমান চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁরা চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ঔষুধ তৈরীর নিয়মকানুন সম্পর্কিত বই পুস্তত রচনায় অসামান্য অবদান রেখেছেন। এদের মধ্যে আল রাযী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

ইরানের রাজধানী তেহরান। তেহরানের একটি এলাকার নাম রায়নগর। এখানেই জন্ম হয় আবু বকর মোহাম্মদ ইবনে জাকারিয়ার। সেটা ছিল ৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। রায়নগর ছিল একটি শিক্ষা কেন্দ্র। এটি মৃৎ শিল্পের জন্যেও প্রসিদ্ধ ছিল। জন্মভূমির নামানুসারে আবুবকর রাযী নাম ধারণ করেন।

প্রায় ২০ বছর বয়সে বিদ্যা শেখার জন্য তিনি বাগদাদে যান। সেখানে বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ ইবনে ইসহাকের কাছে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন। রসায়ন শাস্ত্রেও তাঁর অনেক দখল ছিল। বাগদাদে থাকাকালে তিনি গ্রীক চিকিৎসা বিজ্ঞান/ইরানী চিকিৎসা প্রনালী এবং ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি পদার্থ বিজ্ঞান ও দর্শনেও পন্ডিত ছিলেন।

শিক্ষা শেষ হওয়ার পর তিনি কিছুদিন জুন্দেশাপুর বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্রে শিক্ষানবিশী করেন। এ সময় চিকিৎসক হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সবধরনের রোগী তাঁর কাছে আসতে থাকে। তাঁর চিকিৎসায় রোগী ভাল হয়ে যেত। এর ফলে মানুষ তার

www.icsbook.info

জন্য দোওয়া করতো। তিনি জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় বেশী মন দিতে পারলেন না। বরং চিকিৎসা বিজ্ঞান নিয়েই সারাজীবন কাটান। সেকালে বাগদাদে তার মতো এত বড় চিকিৎসক আর কেউ ছিল না। তিনি খলিফা আল মুক্তাদিরের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। খলিফার অনুরোধে তিনি কয়েক বছর রায়, জুন্দেশাপুর ও বাগদাদের সরকারী হাসপাতালের প্রিন্সিপালের দায়িত্বপালন করেন। এ সময় পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব ইউরোপ থেকে দলে দলে রোগীরা নিরাময়ের আশায় তাঁর কাছে ছুটে আসতো। খৃষ্টান ও ইহুদীরা পর্যন্ত তাঁর কাছে থেকে শিক্ষা গ্রহনের জন্য ভীড় জমাতো।

আল রাযী আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রনালীর মতো তাঁর নিজস্ব প্রনালীতে চিকিৎসা করতেন। তাঁর শিক্ষাদানও ছিল উন্নত ধরনের। তিনি ছাত্রদের হাতে কলমে শেখাতেন। তিনি ছাত্রদের হাসপাতালে গিয়ে রোগীদের সেবা যত্ন করে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের কথা বলতেন। সার্জারি বা শল্য চিকিৎসাতেও তার জোড়া মেলা ছিল ভার। তিনি গ্রীকদের চেয়ে উন্নত ভাবে সার্জারি করতেন। তখনকার দিনে রাযীর হাতে চিকিৎসা লাভকে রোগীরা আল্লাহর অপূর্ব নিয়ামত মনে করতো। তার হাতে চিকিৎসা করতেই তারা নিজেদের নিরাপদ ভাবতো। রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় তিনি প্রচুর অর্থ আয় করতে থাকেন। তিনি ৪০ বছর পর্যন্ত চিকিৎসায় নিয়োজিত থেকে বহু জ্ঞান লাভ করেন। তিনি কয়েক বছর নানান দেশে সফর করেন। সে সময় বিভিন্ন দেশের রাজা বাদশাহরা তাকে বহু উপহার দেন।

শেষ বয়সে আল রাযীর দু'চোখে ছানি পড়ে। এর ফলে তিনি অন্ধ হয়ে পড়েন। তাকে অস্ত্র চিকিৎসা নেয়ার প্রস্তাব দিলে তিনি অস্বীকার করে বলেন, বহুদিন যাবত

www.icsbook.info

আমি দুনিয়ার রূপ দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। তিনি ৬৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

আল রাযী আল কেমির চর্চা করতেন। তিনি নানা প্রকার এলকোহলিত স্পিরিটও আবিষ্কার করেন। তিনি কিতাবুল আসরার (রহস্যের গ্রন্থ) নামে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। জিরার্ড ১১৮৭ খৃষ্টাব্দে এটিকে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন। চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এই বইটি ইউরোপের সকল বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ছিল।

তিনিই প্রথম পদার্থের শ্রেনী বিভাগ করে রাসায়নিক পদার্থকে উদ্ভিদ প্রানী ও খনিজ হিসেবে বিভক্ত করেছেন। বর্তমানেও তার এই পদ্ধতি আধুনিক ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত। খনিজ দ্রব্যকে তিনি তরল ও নিরেট দ্রব্য পাথর, গন্ধক, সোহাগ ও লবনে বিভক্ত করেছেন। তিনি উদ্বায়ী ও অনুদ্বায়ী স্পিরিটে পার্থক্য দেখিয়ে গন্ধক, পারদ, আর্সেনিক ও আল এমোনেয়াককে স্থান দিয়েছেন। তিনি কৃত্রিম উপায়ে বরফ তৈরী করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। কেননা সে সময় পানি থেকে বরফ তৈরীর প্রনালী মানুষ জানতনা।

আল রাযী চিকিৎসা বিজ্ঞানে একশোটি বই রচনা করেন। অন্যান্য বিষয়েও একশোটি বই রচনা করেন। প্রায় প্রত্যেক রোগ সম্পর্কেই তিনি ছোট ছোট বই লিখে গেছেন। মানুষের কিডনী ও গল ব্লাডারে কেন পাথর হয় সে সম্পর্কে তিনি একটি মৌলিক তথ্যপূর্ণ বই লিখেছেন। তিনি লাশ কাটার বিষয়েও আলোচনা করেছেন। কিন্তু তিনি বসন্ত ও হাম রোগ সম্পর্কে সর্বপ্রথম বিজ্ঞান সম্মত আলোচনা করেন। এই একটি

www.icsbook.info

মাত্র কারনেও তিনি স্মরণীয় হয় থাকবেন। এ সম্পর্কে তিনি রচনা করেন "আল জুদারী ওয়াল হাসবাহ" নামক গ্রন্থটি। এটি ল্যাটিন ও ইউরোপের সকল ভাষাতে অনুবাদ হয়। শুধুমাত্র ইংরজী ভাষাতেই এটি ৪০ বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

ইরানে থাকাকালে আল রাযী চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিখ্যাত গ্রন্থ "কিতাবুল মনুসরী" রচনা করেন। ১৫ শতকে এই বইটির ল্যাটিন অনুবাদ প্রকাশ করা হয়। এছাড়া তিনি আরেকটি চিকিৎসা গ্রন্থ কিতাব আল মুলুকী রচনা করেন।

আল রাযীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হচ্ছে "আল হাবী"। এতে সর্বপ্রকার রোগ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া এটি একই সাথে চিকিৎসার প্রণালী ও ঔষুধের ব্যবস্থা সম্বলিত একখানি অভিধান। এই বিরাট বই এর ২০টি খন্ড আছে। সিসিলির রাজা প্রথম চার্লসের আদেশে ইহুদী চিকিৎসক ফারাজ ইবনে সলিম এটিকে ভাষায় অনুবাদ করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে আল হাবী ইউরোপীয়দের মনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। আল হাবীর নবম খন্ডটি ইউরোপের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ষোল শতক পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল। এই বইটিতে আল রাযী প্রত্যেক রোগ সম্বন্ধে প্রথমে গ্রীক, সিরীয়, আরবী, ইরানী ও ভারতীয় চিকিৎসা প্রণালীর বিস্তৃত বর্ণনা দেন তারপর নিজের মতামত ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন। আল হাবী ও আল জুদারী ওয়াল হাসবাহ চিকিৎসা বিজ্ঞানের অসাধারণ গ্রন্থ। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম চিকিৎসাবিদ এবং বিশ্বের সকল

www.icsbook.info

যুগের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের অন্যতম। ইবনে সিনা ও রুশ্‌দের পর আল রাযীর মত কোন মুসলিম মনীষী শিক্ষা ও রেনেসাঁয় তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি।

আল রাযীই প্রথম মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার কথা চিন্তা করেন। তাঁর গ্রন্থে এ ধরনের চিকিৎসার উপকারিতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। তিনি 'মানসিক শরীর' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে মনোবিদ্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আল রাযী দর্শন শাস্ত্রে পন্ডিত ছিলেন। সম্প্রতি তাঁর একটি আত্মজীবনীর সন্ধান পাওয়া গেছে। এতে তিনি বলেন, তিনি গ্রীক দর্শন ভালভাবে জানেন। তিনি প্লেটোর দর্শনের উপর ভাষ্য লিখেছেন, অ্যারিষ্টটলের ন্যায়শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত সার রচনা করেছেন। পোরফিরির মতবাদ খন্ডন করেছেন।

✪✪✪

www.icsbook.info

আব্দুর রহমান জামী

ইরানের খোরাসান প্রদেশের একটি ছোট শহর। নাম তার জাম্। এই জাম শহরে মোল্লা নূরউদ্দিন আব্দুর রহমানের জন্ম হয়। দিনটি ছিল ৭ই নভেম্বর। আর সাল ছিল ১৪১৪। জন্মভূমি জাম থেকেই তিনি জামী উপাধি পান এবং এই নামেই বিখ্যাত হন।

তাঁর পিতা ছিলেন একজন নামকরা পন্ডিত ব্যক্তি। পিতার কাছেই তিনি আরবী ফার্সি ভাষা শেখেন। তিনি তফসিরে কোরআন, হাদিস, ফিকাহ ও আরবী ব্যাকরন পিতার কাছ থেকেই ভালভাবে আয়ত্ব করেন।

পিতার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ সম্পর্কে জামী বলেন, আমি যদি সত্যিই কারও ছাত্র হই, তবে তা' আমার পিতার। কারণ তিনিই আমাকে ভাষাশিক্ষা দেন। ছোটবেলায় জামী খুবই দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। বিদ্যালয়ের বাঁধা ধরার মধ্যে তিনি হাঁপিয়ে উঠতেন। সুযোগ পেলেই তিনি পালিয়ে গিয়ে খেলাধুলা করতেন। তাঁর বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত প্রখর। মেধা ছিল তীক্ষ্ণ আর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। এ কারণেই ছোট বেলা থেকেই তিনি সহজেই কঠিন পড়া মুখস্থ করতে পারতেন।

কোন সময় দেখা গেল তিনি পথে বসে খেলাধুলা করছেন। এদিকে বিদ্যালয়ে যাবার সময় হয়ে গেছে। অথচ তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই খুলেও দেখেননি। কাজেই তার পাঠ মুখস্থ হয়নি। হঠাৎ তিনি কোন

www.icsbook.info

সহপাঠির কাছ থেকে বই কেড়ে নিয়ে সেদিনের পাঠ দেখে নিলেন। তারপর ক্লাসে সুন্দরভাবে পড়া দিলেন। এতে সকলেই মুগ্ধ হয়ে যেত। এরকম ঘটনা তাঁর জীবনে বহুবার ঘটেছে।

তিনি ইতিহাস, দর্শন, সুফীতত্ত্ব, কবিতা রচনা, ছন্দ প্রকরণ ও সঙ্গীতে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। মোল্লা জুনায়েদ ও খাজা আলী সমরকন্দী ছিলেন তাঁর প্রধান দু'জন শিক্ষক। জামী এতই প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন যে খাজা আলীর কাছ থেকে ৪০টি পাঠ নিয়েই তাঁর শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি সমরকন্দের কাজী রুমের মত পন্ডিত ব্যক্তির কয়েকটি বক্তৃতা শুনেই তাঁর সঙ্গে বিতর্কে লড়েন এবং শিক্ষককে পরাজিত করেন। উদারমনা শিক্ষক কাজী রুম এতে কোন অপমান বোধ করেননি। বরং তিনি এমন প্রতিভাবান ছাত্র পেয়ে গৌরববোধ করেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, সমরকন্দ শহরের পত্তন হওয়ার পর জামীর মত এতবড় পন্ডিত আর কখনো এখানে আসেননি।

ছোট বেলা থেকেই জামী পীর দরবেশদের খুবই ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। যারা আল্লাহর ভালবাসায় মাতোয়ারা হয়ে দুনিয়ার সাময়িক সুখ বর্জন করেন এমন লোকরা তার কাছে প্রিয় ছিল। এজন্যে সুযোগ পেলেই তিনি ওলি দরবেশের সাথে সময় কাটাতেন। জামী তখন শিশু। তার আব্বা একজন প্রসিদ্ধ দরবেশের কোলে তাকে তুলে দিয়ে তাঁর দোওয়া কামনা করেছিলেন।

জামী তখন যুবক। এ সময় অনেক নামকরা সুফীর সাথে তিনি উঠা বসা করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

ছিলেন, শাম্‌সদ্দিন মোহাম্মদ আসাদ ও ওবায়দুল্লাহ আহরার। তিনি বিখ্যাত সাধক সাদ আল দীনের হাতে দীক্ষা নেন। তাঁর শিক্ষক তাকে তাসাউফের শিক্ষা দান করেন। জামী একজন সত্যিকার সাধকের মতই সব ধরনের কৃচ্ছতা অবলম্বন করে সহজ সরল জীবন যাপনের অভ্যাস করেন। সাদ আল দীন তাঁর সাধনায় মুগ্ধ হয়ে তাকে আবার লোকজনের সাথে মেলামেশার অনুমতি দেন।

জামী একবার হজ্বের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। প্রথমেই তিনি বাগদাদে এলেন। তাঁর বিরোধী পক্ষের লোকজন তাকে শায়েস্তা করার জন্য তাঁর কবিতার অংশ বিশেষ বিকৃত করে তার বিরুদ্ধে জোরপ্রচার চালায়। ফলে জামীকে এক বিরাট সভায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে কিছু বলতে হয়। বাগদাদের শাসক এই সভা পরিচালনা করেন এবং এতে উপস্থিত ছিলেন, হানাফী, শাফেয়ী ও শিয়া সম্প্রদায়ের পন্ডিত ব্যক্তিগণ। তাঁর শত্রুপক্ষ কবিতাটি পাঠ করলে তিনি আসল কবিতা পাঠ করেন। তাতে ধরা পড়ে যে শত্রু পক্ষ আসল কবিতাটির প্রথম ও শেষ অংশ বাদ দিয়ে এমন একটি অংশ জুড়ে দিয়েছে যাতে বাগদাদের জনসাধারণকে সহজেই ক্ষেপানো যায়। জনগন আসল কবিতাটি শুনে খুশি হল এবং কবিকে শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করলো।

জামী বাগদাদে ৪ মাস থাকার পর মক্কা শরীফের দিকে রওনা হলেন। পথে প্রত্যেক শহরেই কবিকে বিশেষ সম্বর্ধনা জানানো হয়। আলেপ্পোতে থাকাকালে জামী পাঁচহাজার স্বর্ণমুদ্রাসহ বহু উপহার সামগ্রী পান।

www.icsbook.info

তুরস্কের সুলতান দ্বিতীয় বায়যিদ এসব উপহার পাঠিয়েছিলেন। জামী তাব্রিজে যান। সেখানকার শাসক হাসান বেগও কবিকে সেখানে থেকে যাওয়ার জন্য বহু অনুরোধ জানান। কবি বৃদ্ধা মায়ের সাথে দেখা করার কথা জানিয়ে তাব্রিজ ত্যাগ করে খোরাসানে ফিরে আসেন। কিন্তু খোরাসানেও তার রেহাই নেই। চারদিক থেকে রাজা বাদশাহ আর সর্বস্তরের মানুষ কবিকে অজস্র উপহার সামগ্রী পাঠাতে লাগলেন। সাধক কবি জামী ভক্তদের ভালবাসার অত্যাচার থেকে বাঁচার আশায় হিরাতের এক নির্জন স্থানে চলে যান এবং এক মনে আল্লাহর বন্দেগীতে মশগুল হন। এ ভাবে নির্জন স্থানে থাকা কালে ১৪৯২ সালের ৯ ই নভেম্বর ৭৮ বছর বয়সে জামী ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালের খবরে খোরাসানের মানুষ শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অনেক যত্ন ও তাজিমের সাথে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। অনেক রাজা বাদশাহ, আমীর ওমরাহ, আলেম ও মুফতী সহ লাখ লাখ লোক তার জানাযায় শরীক হন।

জামী একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তারচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিনি হচ্ছেন একজন অসামান্য পন্ডিতও ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বিখ্যাত পন্ডিত নাসুলীজ বলেছেন, কেবল কবি হিসেবেই নয়, পন্ডিত হিসেবে বিবেচনা করলে একথা বলা যায়, জামী একজন অসামান্য প্রতিভাদীপ্ত পন্ডিত ছিলেন।

জামী তার পীর ও মারেফাতের শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করতেন। তিনি সমসাময়িক কবিদের মতো কখনো ধনী বা ক্ষমতাশালীদের দুয়ারে ধন্না দেননি বা

www.icsbook.info

চাটুকারদের মতো সুলতান বা আমীরদের প্রশংসা করে কোন কবিতা লিখে তাদের দয়া প্রার্থনা করেননি। কবি জামী তাঁর জীবিতকালেই সে সময়কার রাজাবাদশাহ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষের ভালবাসা, ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করেছেন। কিন্তু এত কিছুর পরেও কিন্তু তিনি গরীব দুঃখী মানুষকে ভুলতেন না। তিনি তাদের দুখ দূর করার জন্য অকাতরে দান করতেন।

জামী বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত তুহফা ই সামী গ্রন্থে তাঁর লিখিত ৪৬টি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। তিনি শেখ সাদীর গুলিস্তার অনুকরণে 'বাহারিস্তান' (বসন্তের দেশ) নামে একটি বিখ্যাত গদ্যগ্রন্থ ১৪৮৭ সালে রচনা করেন। এতে ৮টি রওযা (উদ্যান) নামে অধ্যায় আছে প্রত্যেক রওযায় সুফী ও দরবেশ, দার্শনিক ও জ্ঞানী, সুলতান খলিফাদের ন্যায় বিচার, দানশীলতা, প্রেম, রসিকতা ও বাকপটুতা, কবি ও অবোধ প্রাণীদের সম্পর্কে মনোরম ও চমৎকার কাহিনী বর্ণিত আছে। বইটি গুলিস্তাঁর মতই গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রনে লিখিত।

জামীর 'লওয়ায়ীহ' একটি বিখ্যাত বই। এতে তিনি আল্লাহর প্রেমিকদের সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি পার্থিব জ্ঞানের তুচ্ছতা ঘোষণা করে আল্লাহর পথেই জ্ঞান বিকাশের মহিমা গেয়েছেন। তিনি বলেন,

ছায়াবাজির মিথ্যা খেলায় মত্ত তুমি আজ
তাঁর হুকুমে মিলিয়ে যাবে তোমায় দিয়ে লাজ।
সঁপো হৃদয় তাঁর নিকটে নেইকো যাহার লয়
সকলকালে থাকবে যিনি হয়ে তোমা-ময়।

জামী সাতটি মসনবী কাব্য এবং তিনটি দিওয়ান বা গযল কবিতা সংগ্রহ রচনা করেন। সাতটি মসনবী

www.icsbook.info

কাব্যের ১টি হচ্ছে সিল সিলাতুল যাহাব। এতে সাতহাজার দুশো বয়েত আছে। এতে দার্শনিক, নৈতিক, ও ধর্মীয় জ্ঞান বিষয়ক বহু উপাখ্যান আছে। দ্বিতীয় কাব্য হচ্ছে সলামান ওয়া আবসাল। এটি একটি অনন্য সাধারণ রূপক কাব্য। এতে নশ্বর বিকৃত প্রেমের বন্ধনমুক্ত স্বর্গীয় অবিনশ্বর প্রেমের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। তৃতীয় কাব্য হচ্ছে, "তুহ্‌ফাতুল আহ্‌রার।" এটি একটি নীতিগর্ভকাব্য। তাঁর চতুর্থকাব্য হচ্ছে 'সবহাতুল আবরার' (ধার্মিকের জপমালা)। এটিও দার্শনিক, নৈতিক ও মিষ্টিক ভাবপ্রধান কাব্য। পঞ্চম কাব্য হচ্ছে, ইউসুফ ওয়া জুলায়খা। এটি একটি শ্রেষ্ঠ প্রেমমূলক কাব্য এবং সবচেয়ে বেশী প্রচারিত ও সমাদৃত। ষষ্ঠ কাব্য হচ্ছে লায়লা ওয়া মজনু এবং সপ্তম কাব্য হচ্ছে, খিরদ নামা-ই-সিকান্দারী।

জামীর কবিতা সম্পর্কে পন্ডিত মির্জা বিহরুজ বলেন, জামীর কবিতা নিজামীর কবিতার সমকক্ষ। কাব্যরূপ, মাধুর্য ও সারল্যে তার কবিতা অসাধারণ। তাঁর কবিতা অনায়াসে সকলে পড়তে পারে। এজন্য তিনি ইরানের বাইরেও জনপ্রিয়। অপরদিকে নিজামীর কবিতা বুঝতে হলে ফার্সি ভাষায় গভীর জ্ঞান থাকতে হয়। পন্ডিত লোক ছাড়া অন্য কেউ নিজামীর কাব্যের মর্ম বুঝতে পারবেনা।

সমাপ্ত

✪

✪✪

✪✪✪

www.icsbook.info

আরজু পাবলিকেশন্স প্রকাশিত
ও ঢাকা বুক কর্ণার পরিবেশিত অন্যান্য বই

- আদাবে জিন্দেগী - আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী
- বিজ্ঞানময় কোরআন Al-Quran Is All Science - মুহাম্মদ আবু তালেব
- ইসলামের সমাজ দর্শন - মাও. সদরুদ্দীন ইসলাহী
- মহররমের শিক্ষা - সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.)
- ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ:) - মাও. রশীদ আখতার নদভী
- ইসলামের পুনর্জাগরণে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের ভূমিকা- মাও. খলীল আহমদ হামেদী
- রোযার মর্মকথা - ইমাম গাজ্জালী (রহ.)
- ভ্রূণের আর্তনাদ - শাহীন বেগম
- ৪০ হাদীস: ব্যাখ্যা ও শিক্ষা সম্বলিত - মাওলানা হামিদা পারভীন
- দারসুল কুরআন ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ড - মাওলানা হামিদা পারভীন
- ইসলাম বিদ্বেষীদের অপপ্রচারের জবাব - আবু বকর সিদ্দীক
- ছোটদের ইমাম বোখারী - নূর মোহাম্মদ মল্লিক
- ছোটদের শহীদ হাসানুল বান্না - নূর মোহাম্মদ মল্লিক
- ফুটলো গোলাপ মিশরে - নূর মোহাম্মদ মল্লিক
- ফুটলো গোলাপ ইরান দেশে - নূর মোহাম্মদ মল্লিক
- সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য - ড. হাসান জামান
- ইসলামী শিক্ষার অগ্রগতির পথে - ড. হাসান জামান
- আত্মশুদ্ধির পথ - হাসানুল বান্না

আরজু পাবলিকেশন্স

পরিবেশনায়

ঢাকা বুক কর্ণার

৬০/ডি পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০

মোবাইল : ০১৭১১০৩০৭১৬